লাল-পতাকা

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, বি-এ

ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, কেরাণীমহল, সি, পি উইক্‌লি নিউজ,
লোকমিত্র, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রাপ্তিস্থান
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা

ফাল্গুন—১৩৩১

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—গ্রন্থকার
শ্যামবাবুর ঘাট,
চুঁচড়া, হুগলী।

প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র

দেব-প্রতিম

পিতৃদেব ৺পুলিনবিহারী দত্তের

পুণ্যস্মৃতি স্মরণে

পরিচয়

সকল দেশেই সকল যুগেই কতকগুলি খামখেয়ালী যুবক দেখিতে পাওয়া যায়—আধুনিক বাংলাদেশেও। সেইরূপ একটী খামখেয়ালী জীবনের ছায়া লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। কেবলমাত্র আগাগোড়া যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর্টের রং ফলাইবার ও বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। এই অস্বাভাবিকত্বটুকু কতখানি স্বাভাবিক হইয়াছে, শুধু এইটুকুই দশজনে বিচার করিবেন!

এই পুস্তকে লিখিত মতবাদ গ্রন্থকারের নিজের নহে, তাহা সেই চরিত্রেরই।

ইহাতে কোন জিনিসের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই—বিদেশীয় বিচারক যে ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন, বিচারাসনে বসিয়া অনেকস্থলে পুলিশের দোষ ও ক্ষমতার অপব্যবহার দেখাইতে পারেন—সত্য ও অসত্যকে চিনিতে পারেন, তাহাও দেখা যায়। সুতরাং পরাকাষ্ঠা কোন জিনিসেরই দেখান হয় নাই। ইতি—

শ্যামবাবুর ঘাট,
চুঁচড়া, হুগলী।

—গ্রন্থকার

লাল-পতাকা

প্রবেশিকা

দেবগ্রামের যেখানে ঘন-পল্লব-নিবিড়-শ্যাম অটবী ভেদ ক'রে, অতীতের জীর্ণ স্মৃতির মতন একটি ভাঙ্গা মন্দির উঠেছে, যার চারিধারে বটগাছের শিকড়, উর্দ্ধে কাকের কর্কশ ক্রীড়া, যার নিম্নে গৃহস্থের লগুড়াঘাত-তৃপ্ত দুষ্ট কুকুরের বিশ্রাম, যার মধ্যে সহস্র বৎসরের নির্ব্বাপিত দীপশিখার পূত ভস্ম পেচক-পুঙ্গবদের অঙ্গরাগ,—এ হেন মন্দিরের ভগ্ন প্রাঙ্গণে তরুণ খেলা করিতেছিল। বৌদির পায়ের আল্‌তা খানিকটা একটা মাটির পাত্রে ঢালিয়া আনিয়াছিল, আর আনিয়াছিল এক টুকরা ছেঁড়া কাপড়। কাপড়টা এমন ভাবে ছেঁড়া যে তাহাকে সমবাহু ত্রিভুজ বলিলেও চলে এবং গ্রন্থকারের জ্যামিতির পরিচয় দেওয়াও চলে। তরুণ সেই ছেঁড়া ত্রিভুজাকৃতি কাপড়ের খণ্ডটি বৌদির রক্ত-অলক্ত-রাগে রঞ্জিত করিতেছিল। ভারী স্ফূর্ত্তি, সে স্ফূর্ত্তি দেখে কে! এমন সময় পাড়ার সেরা দুষ্টু ছেলে অজয় আসিয়া জুটিল।

কি কচ্ছিস্ রে!

ভাই পতাকা! পতাকা তৈরী করবো, একটা ডাণ্ডা এনে দিবি?—যা ওইখান থেকে একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে আয়—বেশ মজা হবে!—হো! হো!

বটে? বেশ হবে,—আচ্ছা আমি আন্‌চি।

বেশ বড় দেখে আন্‌বি, শক্ত দেখে আন্‌বি বুঝেছিস্? আমার লাল-পতাকা!

লাল পতাকা!—হো হো লাল-পতাকা!

বেশ মজা, আমাদের লাল-পতাকা!

অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া অজয় ডাণ্ডা ভাঙ্গিল—সেখানকার নিকটবর্ত্তী নাগাল পাওয়ার মত যত গাছ ছিল সবগুলি বাছিয়া বাছিয়া সব চেয়ে সরেস ডাণ্ডা অজয় হাজির করিল।

তরুণ অতি যত্নের সহিত ডাণ্ডা লাল-পতাকায় সংযোজিত করিল। অবশ্য অজয় বাড়ী থেকে গুণ ছুঁচ ও সূতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

তার পর অরুণ সেই লাল-পতাকা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিল।

দেবগ্রামের পার্শ্বেই পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী! সেই প্রাবৃটের আকাশ-জোড়া মেঘ, সেই কালবৈশাখীর গুরু-গম্ভীর প্রলয়সূচক উদাত্ত সমীরণ,—আর তরুণের হাতের লাল-পতাকা। পত্ পত্ শব্দে দেবগ্রামের ভাঙ্গা মন্দিরের পার্শ্বে পতাকা উড়িল। অজয় দুষ্টু ছেলে,—লাল-পতাকা! লাল-পতাকা! শব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল, সে শব্দ সন্ধ্যাদীপ-হস্তা শতেক পল্লী-জননীর অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছিল;—তার কারণ শুধু 'লাল-পতাকা' নয়, তার কারণ অজয়ের কণ্ঠস্বর। পাড়ার মায়েদের ধারণা ছিল, অজয়ই তাদের ছেলেদের মাথা খাইতেছে, চল্‌তি কথায় 'বকাইতেছে'। বাস্তবিক অজয়ের ডাকের—

এমন একটা মাহাত্ম্য ছিল যে, পাড়ার ছেলেরা দুনিয়ার সংযম বাঁধন ছিঁড়িয়া ছুটিয়া আসিত, কেহই রোধ করিতে পারিত না! এক্ষেত্রে হইল তাহাই, পাড়ার গোবরা, হরে, ভোঁদা, রামু যেখানে যারা ছিল সদলে ছুটিয়া আসিল—আসিল সেই লাল-পতাকার নীচে। তরুণের হাতে লাল-পতাকা,—অজয়ের হুঙ্কার, আর সেই মত্ত বালকদল। একটা ক্ষুদ্র শোভা যাত্রার মত, সেই ক্ষুদ্র বালকের দল দেবগ্রামের পথে বাহির হইল,—আর তাদের সেই সমবেত কণ্ঠস্বর 'লাল-পতাকা' সেই দুর্দ্দিনের সন্ধ্যায় পল্লী-কুটীরে ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সংসারের বৈচিত্র্যই এমন, যেখানে বৃদ্ধেরা অকর্ম্মণ্য, সেখানে যুবকের শাশ্বত অধিকার, আবার যেখানে যুবকের ঔদাসীন্য সেখানে বালকের প্রভুত্ব। বৃদ্ধেরা তখন তামাকের টিকেতে জোর করিয়া ফুঁ দিতেছে, যুবকেরা হয় ত উচ্চহাস্য বন্ধ করিয়া একটু প্রেমিকের মত গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বালকেরা? তারা প্রকৃতির প্রতি ছন্দে, প্রতি রঙ্গে, তাল দিতেছে।

প্রকৃতির ভীষণ রঙ্গিনী মূর্ত্তি, আর তাদের কলরব 'লাল-পতাকা'! তারা যেন কোন বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জের মত দেবগ্রামের যতটুকু আনন্দ সব লুট করিতে বাহির হইল।

সে আনন্দ-সজ্ঞে যোগদান করিতে কালু ঘোষের ছেলে ভুলুও আসিয়াছিল। কালু ঘোষের বিধবা মেয়ে কুলঘাতিনী হইয়া বাহির হইয়া গেলে, পরাশর ভট্টাচার্য্যের মতে তিনি একঘোরে হইয়াছিলেন। গ্রামের অন্যান্য লোকের সহিত উহার আচার-ব্যবহার নিষেধ। এমন কি তাঁহার ছেলে যদি অন্য লোকের ছেলের সহিত খেলা করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তিও একঘোরে হইবেন এইরূপ সর্ত্ত।

কিন্তু ভুলু দলে মিশিয়াছে, কেহ তাহাকে বাধা দেয় নাই,—বালকেরা এ সামাজিক বাধার ধার ধারে নাই।

কিন্তু পরাশর ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যখন এ শোভাযাত্রা যাইতেছিল, তখন এ ভুল সংশোধিত না হইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তিনি এক টিপ্ নস্য নাকে আচ্ছা করিয়া গুঁজিয়া, বেশ মৌতাত করিয়া ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বৈঠকখানার দরজাটি খুলিবামাত্র, ছেলেদের আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল। পাড়ার ছেলে বুড়ো সকলেই পরাশর ভট্টাচার্য্যকে ভয় করিত। হ্যাঁরে ছোঁড়ারা, এ বর্ষা বাদলে ও সব কি কীর্ত্তি হচ্চে! দাঁড়াও সব মজা দেখাচ্ছি।

অজয় চীৎকার করিয়া উঠিল 'লাল-পতাকা',—হো! হো!

ব্যাটাচ্ছেলে, লাল-পতাকা ওড়ানো হচ্চে, দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। হ্যাঁরে, তরুণ,—ফ্যাল বল্‌চি লাল-পতাকা, নইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো বলে দিচ্চি।

না ফেল্‌ব না—এ আমাদের লাল-পতাকা।

বটে? এ কালে কালে হলো কি! কি ঘোর কলি! এই দেবগাঁয়ে কারু বাবার সাধ্যি হয়নি লাল-পতাকা ওড়াবার, এই একরত্তি ছেলে—

বলিয়া পরাশর ভট্টাচার্য্য ছেলেদের তাড়া করিতে গেলেন।

২

দল বাঁধিয়া অসত্যকে সত্য করিবার প্রয়াস শুধু সমাজ বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের বা যুগ বিশেষের ধর্ম্ম নয়। এমনো দেখা যায়—অসত্যকে সত্যের বেশ পরাইয়া মানব জাতি যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বর্ব্বরের বীভৎস নৃত্য করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে শক্তির বিকাশ, সমাজের শত শৃঙ্খল জড়িত সংস্কারের মধ্যে অতি দুর্লভ। খাটিয়া খাইলে তাহাকে দাসত্ব বলে না, কুসংস্কারাবদ্ধ সমাজ-দানবের বেত্রাঘাতের ভয়ে ব্যক্তিত্বকে বলিদান অথবা জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সত্যকে দলিয়া অসত্যকে আঁকড়িয়া ধরিবার প্রয়াসকেই দাসত্ব বলিয়া থাকে। দাসত্ব কিম্বা স্বাধীনতা প্রধানতঃ অন্তরের জিনিস, বহির্জগতের দাসত্ব বা স্বাধীনতাটা অন্তর্জগতের বহির্বিকাশ মাত্র।

তরুণ যখন শতসুরভিস্বপ্নসঙ্গীতমণ্ডিত যৌবনের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল, তখনি দেখিল সে একটা সৃষ্টিছাড়া জীব। কারুর সঙ্গেই মিল হয় না।······

তরুণ বুকের রক্ত জমিয়ে তার একটি ছোট্ট লাইব্রেরী করেছিল। বাপ ত মরেছে অনেক দিনই,—বাঙ্গালীর ঘরে যেমন মরে থাকে,—আছে মাত্র একটি অতুল্য উপাস্যদেবী—মা। দাদা চাকরী করে, তরুণকে এম-এ পড়ায়,—বৌদিদি ঠাকুরাণী, ঠাকুরপোর মন যোগাতে ত্রুটী করেন না। দেখ্‌তে গেলে তরুণ বেশ সুখী,—যেটার সাধারণ বাঙ্গালীর জীবনে অভাব।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তরুণ কি একখানা কাগজ পড়ছিল—তরুণ বড় একটা বেড়াতে যায় না। এমন সময় অজয় আসিয়া হাজির।

কি রে, বেড়াতে যাবি? আয় না একলাটি—

না—না, তুই বোস্—ঐখানে, দেখেছিস্ আমার একটা আর্টিকেল—

কিসের রে—

এই দেখ্না,—হিন্দুত্বের ভিত্তি—

জানি,—তোর পাগলামী তো?—সেই যেমন লিখেছিলি—'জাতীয়তার মশলা'? সেই মত তো? তোর লেখা কেন যে কাগজে ছাপায় আমি তো বুঝতে পারিনে, আগাগোড়া বাঁদরামি ও পাগলামী!……

তোর সঙ্গে মতের মিল না হলেই যে আমার মত পাগলামী সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনে।

কেন, শুধু আমার মত কেন? বাংলা দেশের—বাংলা কেন, সমগ্র ভারতের সঙ্গে তোমার মতের মিল নেই, সুতরাং তোমার আবিষ্কারটা যে ভুল—পাগলামী, সেটা তোমার বুঝতে এত দেরী হয় কেন তা বুঝতে পারিনে। আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি তোমার রাবিসগুলো কাগজে কি করে লোকে ছাপে!

অজয়—অজয়—তুই আর যা বলিস বল্ আমার স্বপ্নকে রাবিস্ বলিস্ নে।

স্বপ্ন জিনিসটাই রাবিস্—স্বপ্ন দেখ্লে জাতের পেট ভরবে না—স্বপ্ন জাহান্নমের পথ।

স্বপ্ন না দেখে কোন জাতটা বড় হয়েচে বল্তে পারিস?

তোমার মতন আরাম কেদারায় শুয়ে বর্ম্মার চুরুটের ধোঁয়ার সঙ্গে ভাসা ভাসা নেশার মতন স্বপ্ন তৈরী করে কোন জাতই বড় হয় নি।

তুই বড্ড চোটের কথা বলে ফেলচিস্ দেখ্‌চি।

তা ত হবেই—সত্যি কথা বল্‌লে পরে বন্ধু বিগড়ে যায়।

আচ্ছা তুই কি স্বীকার করিস্ যে আজকালকার হিন্দুসমাজ—আমি বাংলার কথা বলচি—একটা প্রকাণ্ড অসত্যের লীলাক্ষেত্র!

না।

তুই কি সত্যকে মঙ্গলকে ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখ্‌তে চাস্ না?

না।

কেন?

যেমনটি এখন আমাদের আছে, সেটা ঠিক এই যুগের উপযোগী—মাফিক সই। আমি পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে চাই না, আর পরিবর্ত্তনের দোহাই দিয়ে কতকগুলো সমাজদ্রোহী বদমায়েস গুণ্ডার প্রশ্রয় দিতে চাই না।

অজয়! তোর মতন বন্ধুরও আমার দরকার আছে—তোর মতে মত দিয়ে আমি আমার প্রকৃতিকে বিকৃত কর্‌তে পার্‌বো না। তবে, তোর মতন লোকের মাঝে মাঝে মজাদার বুক্‌নি, আমাকে অনেক সময় সমজ্‌দার করে তুল্‌তে পার্‌বে।

চল্ চল্, বেড়িয়ে আসি।

না ভাই, আমি যাবো না।

ওই তো রোগ, ঘরের মধ্যে বসে স্বপ্ন দেখ্‌বি, বাইরে অমন

বিরাট বাস্তব পড়ে রয়েচে, তার দিকে ফিরেও চাইবি নে! যত দিন না বাস্তবের সঙ্গে তোর সামঞ্জস্য হয়, তত দিন তোর আশা ভরসা নেই,—যেমন পাগল, ঠিক তেমনটি পাগল থাক্‌বি—চুল পাক্‌লেও—

৩

দেখ্‌তে পাওয়া যায়, বউএর মতন বউ, ভায়ের মতন ভাই, মায়ের মতন মা বড়ই দুর্ল্লভ। অনেক মা আছেন যাঁরা ছেলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন না; তাঁদের মাতৃত্বের দাবী যে কতখানি তা এখনো নিরূপিত হয়নি। সত্যের মাপকাটিতে ছেলের চরিত্র বিচার করবার ক্ষমতা আজকালকার দিনে অনেক মায়েরই নেই। ছেলেকে স্বাধীনতা দিয়ে সত্য পথে চলিবার শক্তি আমাদের জাতের মায়েদের নেই। আবার মা যে কত বড় বিরাট জিনিস, মায়ের মতন মায়ের স্বর্গ-স্পর্শী তুঙ্গ সুবিশাল মাতৃত্বেব চবণে আত্মহারা হওয়া, তাঁর চরণের ধূলিকণা জীবন যজ্ঞের মহাপ্রেরণা করে নেওয়া অনেক ছেলের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

তরুণের মা এক রকমের। সাতেও আছেন, পাঁচেও আছেন। তরুণের দাদা অরুণের সংসারে তিনি ঘোর সংসারী, পাকা গিন্নী। অবশ্য আজকালকার দিনে পাকা গিন্নী বল্‌তে কতকগুলো মুখরা বাচাল অসংযমী অসত্যপ্রয়াসী নারীজাতিকে বুঝায়। তিনি সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। বরঞ্চ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, অথচ গিন্নী। আবার তরুণের মত মাথা-পাগলা ছেলের কাছে সম্পূর্ণ অন্য রকমের। তরুণ যা চায়, অর্থাৎ ভাল যা চায়, তাতে তিনি বরাবর সায় দিয়ে এসেছেন। কথনো মুখের ফাঁসেও তরুণের মত ঘোর বৈরাগ্য ভাবাপন্ন নবীন সন্ন্যাসীর

স্বপ্নের পথের অন্তরায় হন নি। তরুণ লেখাপড়া শিখেও চটপটে নয়, —কুঁড়ে, সংসার-মঞ্চে একটা আস্ত বিদূষক। সকলেই বলে, লেখাপড়া শিখ্‌লে কি হবে, ওটা একটা ষাঁড়ের গোবর। যাই হোক সন্ধ্যাবেলা তরুণের পড়বার ঘরের আলোটি পর্য্যন্ত মাকে জ্বেলে দিতে হয়। তাই সে দিন যখন অজয় ও তরুণ বসে কথা কচ্ছিল, তখন অরুণের মা প্রতি দিনের অভ্যাস অনুযায়ী আলো জ্বেলে দিতে এসেছিলেন। আলো জ্বালা হতে না হতেই অজয় বলে উঠ্‌লো, "মাসীমা, তুমি যে সেদিন তরুণের পাত্রীটির কথা বল্‌ছিলে, তার কতদূর কি হ্‌লো ?"

হবে আর কি বাবা, তরুণের মত নেই, কত বোঝালুম,......

বাস্তবিক, অমন মেয়ে, আর অত টাকা—তরুণের ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি।

টাকার কথা ছেড়ে দাও, মেয়েই ওর পছন্দ হলোনা তো টাকা;...

শুনেছিলুম ত মেয়েটি পরীর মতন......

পরী বলে পরী! আমি নিজে চোখে মেয়েটিকে দেখেছি, যেমন ডাগর চোখ, তেমনি টানা ভুরু, তেমনি একরাশ চুল,......

কি করবো বল, তোমার তরুণের পছন্দই হল না...শুনেছিলুম, তাঁরা খুব বড় লোক, দশ হাজার টাকাও দিতে চেয়েছিলেন!

হাঁ।

তরুণটা একটা আস্ত মাথা-পাগলা—হ্যাঁরে তরুণ, মতলবখানা কি তোর, বিয়ে করবি কি না ?

মতলব আবার কি, বিয়ে করবো বৈ কি,—সময় হলে,—আর শুধু তাও নয়,—আমার বউ হবার উপযুক্ত মেয়ে পেলে তবে।

তোমার বউ হবার উপযুক্ত মেয়ে কি বাংলা দেশে নেই ?

উপস্থিত ত চোখের সামনে পড়ে না।

কেন, তুমি কী একটা মহারথী যে, তোমার বউ হবার মত মেয়ে পাওয়া যায় না? দেখ তরুণ, একটু সামলে চলো, অতখানি আত্মম্ভরিতা ভাল নয়, শেষে পস্তাতে হবে।

তোমরা পস্তাবার কেয়ার কর, তোমরাই পস্তাবে, আমি পস্তাবার ধার ধারি না।

তরুণের মা। অরুণ ত চটে লাল! বলে এমন গোঁয়ার ভাই, দাদার কথা রাখবে না,—লেখাপড়া শিখিয়ে একটা আস্ত বাঁদর তৈরী করেছি,—অতখানি হাম্‌বড়ো হলে কি আজকালকার দিনে চলে! কাল্‌কে বিকেল বেলা খাবার সময় বল্‌ছিল, দুধ দিয়ে একটা সাপ পুষেছি·· ···

তরুণ। বটে, কই এতদিন ত আমি শুনিনি! বিয়েটা ত আমি কর্‌বো, দায়িত্বটা তো ষোল আনা আমারি, এতে আমার মতের তাহলে কোন প্রয়োজন নেই! ওঁরাই যে মতটা দেবেন, সেইটিই ঠিক বলে মেনে নিতে হবে, কেমন কি না!

অজয়। নিশ্চয়ই, একশবার।

তরুণ। তাহলে রইল আমার দাদাভক্তি—এই মাথায়।

তরুণের মা। ছি, হাজার হোক্ দাদা,—তোকে মানুষ কর্‌চে।

অজয়। আজকালকার দিনে এমনিই হয়েচে, বড়কে কেউ বড় বলে মানতে চায় না,—ঘোর কলি, আর এই সব অধর্ম্ম অনাচারের জন্যে আমরা দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছি।

৪

উমাদেবী অর্থাৎ তরুণের মা তরুণের ঘর থেকে চলিয়া যাইবার পরই অরুণবাবু তরুণের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইহার মধ্যে বড় অস্বাভাবিকত্ব ছিল। তিনি বড় একটা তরুণের কক্ষে আসিতেন না, বড় একটা কথাও কহিতেন না। তিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি আফিস হইতে আসিয়াই জলযোগ করিতেন ও পরে বিশ্রাম করিতেন। কিন্তু আজ তিনি তাহা করেন নাই। আফিস হইতে আসিয়াই সটান তরুণের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। কোনও অমঙ্গল আশঙ্কায় উমাদেবী তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে আবার আসিলেন। প্রতিভাদেবী অর্থাৎ তরুণের বৌদিও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনু-বর্ত্তিনী হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অজয় তখনও বসিয়া ছিল। অরুণবাবু উমাদেবী ও প্রতিভাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা এখানে কেন এলে? যাও, তোমরা নিজের কাজ করগে, সব তাতে তোমাদের খোঁজ,—আমার গা বিষ্ বিষ্ করে।

উমাদেবী। বল্ না যা বলবার, আমরা শুনব বই ত নয়।

অরুণ। শুনবে আমার মাথা আর মুণ্ডু, পাত্রীর বাপ আজ শেষ কথা চেয়েছেন, আজকে তার একটা মীমাংসা করতে হবে।

প্রতিভা। তা হোক না, তাতে আর কি হয়েচে, ঠাকুরপোকে একবার জিজ্ঞেস কর, ওঁর মত না হলেও আমরা জোর করে বিয়ে দেবো,—অমন সুন্দরী মেয়ে……

এতক্ষণে তরুণের চৈতন্য হইল। বুঝিতে পারিল, দাদার অকস্মাৎ তাহার গৃহে আগমনের কারণ।

অরুণ। তরুণ, বল তোমার মত,—বাস্তবিক তাঁরা খুব ভদ্রলোক, মেয়ে পরমা সুন্দরী, আর তা ছাড়া দশ হাজার টাকা—

তরুণ। কি বল্‌বো বলুন—

অরুণ। দেখ, এই দশ হাজার টাকা, তোমার আমি এক কপর্দ্দকও ছোঁব না, তুমি আমার ছোট ভাই, ছোট বেলা থেকে তোমায় মানুষ করেছি, আমার ইচ্ছে, তোমায় মানুষ হতে দেখি······

তরুণ। আপনারা মানুষ বল্‌তে কি বোঝেন তা আমি বুঝ্‌তে পারি না।

অরুণবাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"রাস্কেল, তুমি আমায় মনুষ্যত্বের মানে বোঝাতে চাও,—আজীবন পয়সা দিয়ে, গতর দিয়ে, কত দুঃখ কষ্ট করে তোমায় মানুষ করার এই পরিণাম! তোমার উপযুক্ত বয়স, তাই তোমার একটা মত মাত্র নিতে এসেচি, তা নইলে বাড়ীর কর্ত্তা আমি যা খুসী তাই করতে পারি।

তরুণ। করুন,—এখন আমি বিয়ে করবো না।

অরুণ। দেখলে মা, আমার আজীবন কষ্টের সার্থকতা দেখলে?

উমাদেবী। কি করবো বাবা, তোমার বরাত, তা নইলে এমন উপযুক্ত ভাই হয়ে কি ভায়ের কাজ করে না—আমারও এই বুড়ো বয়সে খোয়ার আছে;—একটি বউ, অতগুলি ছেলেপিলে,—কোথায় আর একটা ঘর আলো করা বউ আস্‌বে, দু জায়ে সংসার কর্‌বে, আর আমিও একটু নিষ্কৃতি পাবো,—তা নয়, এই বুড়ো বয়সে গুয়ে মুতে এখনো পড়ে থাকৃতে হলো—আমার বরাত!

অরুণ। আমি আর এম-এর খরচ দিতে পারবো না, এখন একটা চাকৃরী বাকৃরী করুক্,—আর পাশ করেই বা কি হবে—

অজয়। না বড়দা, এম-এ বন্ধ করো না, এতখানি এগিয়ে এসে পেছনো ঠিক নয়—

অরুণ। নাঃ—আমি আর পারবো না, এর ওপর আর কি কথা আছে।

প্রতিভা। না, না, ঠাকুরপো এম-এ পড়ুক, আমরা যেমন কষ্ট করেছি, আরও দিন কতক করি, ও মানুষ হলে আর আমাদের ভাবনা থাকবে না।

অরুণ। তুমি এই ভায়ের প্রত্যাশা কর? ও একটা বাঁদর—আস্ত বাঁদর—ওর কাছে কখনো কিছু আশা করো না,—ঠকৃবে—

প্রতিভা। যাও, যাও, তোমার সব তাতে বাড়াবাড়ি, ঠাকুরপোর মত সৎ ছেলে আজকাল ক'টা দেখতে পাওয়া যায়—

অরুণ। ও সব কথা আমি শুনতে চাই না।

তরুণ উমাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—মা! আমি আর এম-এ পড়ব না—বৌদি, আজ থেকে পড়া বন্ধ করলুম,—চাকরী করবো এবার।

অরুণ। তা বেশ, আফিসে ঢুকিয়ে দেব'খন।

তরুণ। কেরাণীগিরি করা আমার পোষাবে না।

অরুণ। তবে আর কি করবে বলো! আমার শ্বশুর এখন কলকাতায় বদলি হয়ে এসেচেন,—তাঁকে বোলে ক'য়ে দেখবো কি? যদি তোমায় ডেপুটি টেপুটি করে দিতে পারেন।

তরুণ। ও'ত কেরাণীগিরি ছাড়া আর কিছু নয়।

অরুণ। আজকালকার বাজার ত জানো না, পরে পস্তাতে হবে, চাকরীর জন্যে মাথা খুঁড়লেও পাবে না—দিনকাল বড় খারাপ হয়ে আসচে, বোধ হয় বুঝতে পার।

অজয়। তরুণকে নিয়ে আমাদের বড় ভাবনা, না করবে এটা, না করবে ওটা,—হাঁ, যদি বাবার অগাধ জমিদারী থাকতো, তবে এরকম চাল কতকটা মানাতো,—ছি, তরুণ, তোমার ভারী অন্যায়—কি তোমার মনের ভাব স্পষ্ট করে খুলে বল।

তরুণ। মাষ্টারী কিম্বা সংবাদপত্রসেবা ছাড়া আমার দ্বারা অন্য কিছু কাজ হবে না।

অরুণ। অধঃপাতে যাও! লেখাপড়া শিখে একটা আস্ত জানোয়ার হয়েচ!

৫

সন্ধ্যাবেলা। তরুণ কদাচিৎ বাহিরে যায়, কিন্তু সেদিন তরুণ একলাটি বেড়াতে বেরিয়েছে—অনেক দূর। দেবগ্রামের যেখানে সব চেয়ে নির্জ্জন, সব চেয়ে স্নিগ্ধ, সব চেয়ে পবিত্র,—নাম নবাবঘাট, ঠিক গঙ্গার উপরেই,—তার পার্শ্বেই শ্মশান, সেখানে লোকালয় নাই, অতি প্রাচীনকালে নবাবদের আমলের একটা বাঁধান ঘাট আছে,—প্রাচীন বলেই তার এখনো চিহ্ন আছে। সেই ঘাটের সিঁড়িতে রুমাল পাতিয়া তরুণ বসিল, পাশে দু একটা শৃগাল ঝোপের মাঝে যাতায়াত করিতে-

ছিল, সেই যাতায়াতের শব্দ ছাড়া আর পতিতপাবনীর কুলুধ্বনি ছাড়া কোন শব্দ নাই। কিন্তু তরুণের হৃদয়ে বিপুল ঝঞ্ঝা। সামনে গোধূলি, দূর চক্রবালে সন্ধ্যাদেবীর ফাগে ছোপান আঁচলখানি ভাসিতেছিল,—তরুণ সেই আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে বসিল—নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে বসিল।

তরুণ জগতের চক্ষুশূল—বন্ধু শত্রু, ভাই শত্রু, মা শত্রু, বৌদি শত্রু, আর যে যেখানে আছে সবাই শত্রু। কারুর সঙ্গে মতের মিল হয় না।

সে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দা করিয়াছে, চালকলা ভরা ভুঁড়ি দক্ষিণালোলুপ দাম্ভিক অত্যাচারী কলঙ্কিত চরিত্র পুরোহিত পরাশর ভট্টাচার্য্যকে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে গালাগালি দিয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম যে কতখানি বিশাল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, উপনিষদের বিশ্বগ্রাসী স্বপ্নের আড়ম্বর যে হিন্দুত্বের ভিত্তি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে,—হিন্দুধর্ম্মে অত্যাচারীর স্থান নাই, জাতিভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ঘৃণা নাই,—আগাগোড়া প্রেমের পূতমন্ত্রে হিন্দুত্ব যে আবহমান অর্চ্চিত—সবই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে হইয়াছে কি? সে জগতের চক্ষুশূল হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অধিকার,—তাহাদের দাবী কতখানি, তারা যে জাতির মা, জাতির ধাত্রী, জাতির পুষ্টিসাধক তাহা বুঝাইতে গিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। সমাজের মধ্যে সাম্যের কথা কহিতে গিয়া জুতা খাইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের কেরাণীগিরি মনুষ্যত্বকে সঙ্কুচিত করিতেছে, এই ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া কানমলা খাইয়াছে। স্বাধীন চিন্তা জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, এসব কথা কহিতে গিয়া গালি খাইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য-ক্ষেত্রে জাতিকে উঠিতে হইবে,—যদি দরকার হয় সরকারের সহিত ইহার

জন্য বোঝাপড়া করিতে হইবে, ইত্যাদি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে,—ভারতবর্ষে মহাজাতির অভ্যুদয় কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝাইতে গিয়া গলাধাক্কা খাইয়াছে,—তাই আজ তরুণ ভাবিতেছিল ঘরে-বাহিরে সে একটা বিদ্রূপের কেন্দ্র মাত্র। তরুণ যুবক, রক্ত গরম। জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা তাহার কুষ্ঠিতে লেখা নাই। তরুণ এসব নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু মাথা নত করে নাই—প্রতিজ্ঞা করিয়াছে মাথা নত করিবে না,—এবং সেইজন্যই যে সে একটা আস্ত পাগল ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত, তাহাও সে ভাল করিয়া জানে।

তরুণ ভাবিতেছিল, বিবাহ করিবে কাকে? সে কি সুন্দরীর প্রার্থী? হাঁ,—যদি তাহার মন সুন্দর হয়,—তবে সে সুন্দরী;—সে চায় সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহমর্ম্মিণী—কোথায় সে? বাংলাদেশে আছে কি? যদি থাকে দাদা সম্বন্ধ পাতাইলেই কি সে আসিয়া ধরা দিবে? কখনই নয়—অনেকে বলে বাঙ্গালীর মেয়েকে গড়েপিটে নেওয়া যায়, কিন্তু যে মেয়ে দোষগুণ সমন্বিত সংস্কার জড়িত সমাজের সৃষ্টি তাহার দৌড় কতখানি? সে বিবাহ করিবে না,—অপেক্ষা করিবে, যদি আদর্শ পাওয়া যায় তবে,—নচেৎ নয়।

তরুণ ভাবিতেছিল, চাকরীর কথা—পয়সা উপায়ের কথা—মাষ্টারী! বেশ! তাহার একটী নিকট আত্মীয়ের মাষ্টারী যোগাড় করে দেবার বিশেষ হাত আছে—কিন্তু সে খোসামোদিপ্রিয়। খোসামোদি করিতে হইবে! না—না—অমন চাকরী নাইবা হ'লো,—সংবাদপত্র সেবা।—দেখা যাক্ নিজের চেষ্টায় কতখানি কোনদিকে এগুনো যায়!

চিন্তা তরুণের—সুতরাং আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তরুণ যুবক, সেইজন্য হয়ত পাঠক পাঠিকার সহানুভূতি আকর্ষণ

করিতে পারে,—কিন্তু পাঠকপাঠিকারা হয়ত তরুণের বোকামি দেখিয়া একটু হাসিবেন, বোধ হয় এইজন্য—সে খোসামোদি করিবে না। হায়! সে জানে না, এই খোসামোদি ক'রে জগতে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, আর এই খোসামোদির অভাবে জগতের অনেক উজ্জ্বলতম প্রতিভা অবজ্ঞার নীরব-মরুতে নিভিয়া গিয়াছে!

৬

পছন্দ পুরুষের আছে, নারীরও আছে। তুমি চাও লাল টুকটুকে বউ, বড় বড় কাল কাল কোঁকড়ান চুলের রাশ, সরমে ছোপান বড় বড় চোখ, সুন্দর অলৌকিক হাসিটি। নারী চায় বীর—বীর স্বামী। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এরকমটি দেখা গেছে,—নারীর পছন্দের মাপকাটি ঠিক বাহ্যিক রূপ নয়—অন্তরের বিশালতা, মনুষ্যত্ব—এক কথায় বীরত্ব। আমার স্বামী বীর—দশজনের মধ্যে একটা,—একটা যোদ্ধা; ইহাই নারীর প্রার্থনীয় সামগ্রী। পুরুষের মধ্যে রুচি অনুযায়ী বীরত্বকে বেছে নেয়।

অলোকা তরুণকে ভালবাসে। সে তরুণকে দেখেনি—শুধু বাঁশী শুনেছে। তার ফটো দেখিয়াছে—হিন্দুসভ্যতার ভিত্তি শীর্ষক প্রবন্ধের গোড়াতেই যে ফটোটি ছিল, তাহা দেখিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিয়াছে। বাংলা মাসিকপত্রে তরুণের প্রবন্ধ, তরুণের কবিতাকে ভালবাসিয়াছে,—এবং যখন জানিতে

পারিল যে তরুণ স্বজাতি, অবিবাহিত এবং ঘটনাচক্রে কতকটা বাধ্য হইয়া বাবা তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ করিতেছেন, তখন আর ভালবাসা ছাপা গেল না, আলোড়িত, বিক্ষোভিত হইয়া সংস্কারের স্বভাবের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

সাম্‌নে স্বপ্নের রাজ্য কে যেন খুলিয়া দিল, মুকুলিত যৌবনের সম্মুখে যে আব্‌ছা ছায়া, যে যবনিকা দাঁড়াইয়া থাকে, যে কুহেলিকা জীবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া নিপীড়িত করে—সব সরিয়া গেল,—যেন বিশ্বসৃষ্টির মায়াজাল ভেদ করিয়া উলঙ্গ সত্য অপূর্ব্ব জ্যোতিতে অলোকার সাম্‌নে উদ্ভাসিত হইল।

এরূপ আশা মানুষের খুব কমই সফল হয়। অলোকা জানে না তাহার স্বপ্নজাল ছিন্ন হইবে—সত্যকে পাইতে হইলে স্বপ্ন দেখিলে চলিবে না, তাহার সাধনা করিতে হইবে। তীব্র কঠোরতার মাঝখানে মধুকে আহরণ করিতে হইবে।—জানে না তাহাকে এখনি কাঁদিতে হইবে।

অলোকার পিতা অমরবাবু রামপুরের জমিদার। অলোকা তাঁর একটি আদরের মেয়ে। সুতরাং অলোকাকে পাত্রস্থ করা কতখানি দায়িত্ব তাহা বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তরুণ যে একটি ভাল ছেলে তাতে সন্দেহ ছিল না,—তবে যখন অলোকা ঘন ঘন তরুণের প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদি বাবাকে সন্ধ্যাবেলা পড়াইয়া শুনাইত ও আনন্দে আত্মহারা হইত, তখনি অমরবাবুর মনটা যেন একটু তোলাপাড়া করিত। অমরবাবু তরুণকে নিজে ভালরূপে জানিতেন, এবং তরুণ যে স্বজাতি এবং অবিবাহিত তাহাও একদিন কথায় কথায় অলোকার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। এরূপ প্রকাশ পাওয়ায় বিশেষ কিছু

অস্বাভাবিকত্ব ছিল না। তরুণের মতবাদ অমর বাবুর আদৌ ভাল লাগিত না, কিন্তু অলোকা যখন উচ্চকণ্ঠে এসব মতের সমর্থন করিত, তখনই অমরবাবু সেই মতে সায় দিতে বাধ্য হইতেন।

সেদিন অলোকা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া বসিয়া ছিল। সেদিন তরুণের দাদা অরুণবাবু শেষ কথা দিবেন। অমরবাবু কিন্তু সেদিন গম্ভীর ভাবে প্রবেশ করিলেন, তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গেলেন না, তখনই বুঝা গেল গতিক বিশেষ ভাল নয়।

জল খাইবার সময় মহামায়াদেবী অর্থাৎ অলোকার মা যখন সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অমরবাবু উত্তর করিলেন, "অরুণ বাবুর সম্পূর্ণ মত আছে, তরুণ এখন বিবাহ করবে না বলেচে; কাজেই তিনি আমাদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েচেন।"

তরুণ কি বলে, বিয়ে কি করবেই না ?

হাঁ করবে, এখন নয়।

তবে ?

কি জানি !

অলোকাকে যেন এসব কথা ব'লো না, সে হয়ত দুঃখু করবে···

বটে ? এতখানি !

হাঁ।

অলোকা কিন্তু জানালার পেছনে দাঁড়াইয়া সব কথাই শুনিয়াছে।

৭

দেশের সেবা! দেশ কই, দেশের মানচিত্র কই! লোকে বলে নরনারায়ণের সেবা—দেশের নর কি নারায়ণ! যে দেশে মানুষ নাই, মনুষ্যত্বের কদর বুঝিবার লোক নাই,—যে দেশ অধঃপতিত মানব সমাজের আবাসভূমি,—শঠ, প্রবঞ্চক, হীন, কুৎসিত, অলস, হিংসুক, খল, ক্রূর, পরশ্রীকাতর হিংস্র মানব-নিচয়ের সমষ্টি,—যাহার নৈতিক মানচিত্র নাই,—সে দেশের নারায়ণের সেবার জন্য বিবেকানন্দ আবশ্যক, তরুণের মত খামখেয়ালী লোকের স্থান নাই। তরুণ ভাবিতেছিল—ভাবিতেছিল,—সে নির্য্যাতিত। ঘরের আত্মীয়স্বজন তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়াছে, পাড়াপড়্সী নির্য্যাতিত করিয়াছে। সে কাহার সেবা করিবে! ঐ মানব নামধারী কতকগুলি ঘৃণিত পশুর! দেশ ত এই!—দেশ ত ভণ্ডের দেশ, মিথ্যার দেশ, জুয়াচোরের দেশ। আবার ভাবিতে লাগিল—না—না! পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে ঘৃণা করিও না,—ঐ দেশ! ঐ নর নারায়ণ—ঐ এক ঘুমন্ত মহামানব, ঐ যে শতাব্দীর ঝুলে আবরিত পুঞ্জ কুটীর,—হা—হা,—ঐ যে মা!—ঐ যে শ্যাম—শ্যামা জননী, ঐখানে প্রভাতের আলো, গোধূলির গোলাপী রঙ, শত পাপিয়া মুখরিত, শত পুষ্পসুরভি আমোদিত, শত তরঙ্গিনী-হৃদয়া, কোটি কোটি অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধউলঙ্গ, অর্দ্ধজীবন্ত মহামানবের জননী! ঐখানে রোমান্স! ঐখানে পল্লীরাণী গাগর কাঁখে দীঘির পানে ধায়, ঐখানে পল্লীবালা করতালি দিয়া হাসিয়া খেলা করে, ঐখানে পল্লীজননী খাটিয়া খাটিয়াও সংসারের খরচ কুলাইতে পারে না—ঐখানে

দেশের যৌবনের কবর ; দেশে বালক আছে, বৃদ্ধ আছে,—যুবা নাই, দেশে যৌবন নাই ! ঐখানে সন্ধ্যার কাঁসর ঘণ্টা, পূজারিণীর নৈবেদ্য—বিশ্বের এক গৌরবময় সভ্যতার অস্থিকঙ্কাল—প্রাণহীন ! তরুণ ভাবিল,—অনেক ভাবিল—ভাবিল সবাই যা করে তা সে করিতে চায় না, কারুর সঙ্গে মতের খাপ খায় না, না থাক্,—সে লাঞ্ছিত হোক, দলিত হোক, একঘোরে হোক্, যাই হোক, সে নূতনত্বের দাবী করিবে—নূতনভাবে জীবন কাটাইবে। তরুণ ভাবিতেছিল ;—কারণ তরুণের আর কিছু করিবার নাই, কাজকর্ম্ম করিবার নাই। ছ'মাস চুপটি করিয়া বসিয়া আছে, না পারিয়াছে চাকরী যোগাড় করিতে, না পারিয়াছে দেশের সেবা করিতে। সেইজন্য বাঙ্গালীর যা গুণ, ভাবা,—আর নেহাৎ নয় ত কিছু বক্তৃতা করা, তাহার মধ্যে একটা কিছু করিতেছিল।

ছমাস বেকার বসিয়া থাকা,—বিশ্বের চক্ষুশূল হইয়া—যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণকে ভাল করিয়া বুঝাইতে গিয়া আমার মাথা ঘামাইতে হইবে না।

দরখাস্তের পর দরখাস্ত,—চার পয়সার টিকিট, খামকাগজের আত্মশ্রাদ্ধ হইয়া গেল ! চাকরী আর মিলিল না—বি-এ ত সবাই পাশ করে ! সবারি কি চাকরী জোটে ? মুরুব্বী কি সকলেরই থাকে ? আর যেখানে ফাষ্টক্লাস এম-এ হাজারগণ্ডা বসিয়া সেখানে একজন সাধারণ বি-এ'র মাষ্টারীর আশা ! বুকের পাটা ত কম নয় ! মার্চ্চেণ্ট অফিসে ত্রিশ টাকা, রেলেও তাই,—তাও মুরুব্বি চাই—তার পর গেল তোমার একটু ভাল চাকরীর কথা ! দাদার অফিসে চাকরী করিবে না—দাদার শ্বশুর খুব ভাল গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়া

দিতে রাজী হলেন, তাও করিবে না,—করিবে না ত ভেরাণ্ডা ভাজ! ছমাস বসিয়া দাঁত ছিরকুটাইয়া, বিশ্বের গালাগালি খাইয়া দেশ সেবার স্বপ্ন দেখ! পাগল আর কি গাছে ফলে!—বোকা, বোকা, আস্ত জানোয়ার! তরুণ ভাবিতেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াইবে,—ছোট বেলাকার মতন লাল পতাকা লইয়া—কৈ পারলুম কই?—ভাবিতেছিল —আর এক মাস অপেক্ষা করিবে; যদি কোন রকম না জোটে—তবে —তবে?—আত্মহত্যা?—হাঁ।—ছি! ছি! এই কি ব্যাটাছেলের কাজ! ওঃ আর সয় না, বৃশ্চিকজ্বালা!......

রোজ ডাক পিয়নের লালপাগড়ীর আশায় তরুণ পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আজ বোধ হয় চিঠি আস্‌বে। কই, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চলিয়া গেল—সেদিন আর আসিল না। চাকরী হইল না। দাদার ছোট ছেলেটি—দলু কাছে আসিল, দেখিল কাকাবাবু গম্ভীর। কাকা, কাকা, তুমি অমন দিনরাত কি ভাবো! বাবা বকেচে! মা বকেচে! ঠাকুমা বকেচে!—কাকা তুমি ভেবো না,—যে কাকার সদাই হাস্যমুখ, দলুকে লইয়া কত আদর, কত খেলা, সে কাকা অস্বাভাবিক গম্ভীর। কাকা, কাকা, তুমি যা চাও, তুমি তাই পাবে, ভেবোনা, আমি বাবাকে বকবো'খন......

৮

"ওরে তরুণ, সেই বিয়েটা করে ফ্যাল, অমরবাবু শুনেচেন তুই বসে আছিস, তিনি বলে পাঠিয়েছেন, তরুণ যা কর্ত্তে চায়, তাকে আমি তাই করতে দেব, যে দিকে যেতে চায়, যদি ব্যবসা······"

উমাদেবী তার পরদিন তরুণের কাছে প্রকাশ করিলেন।

মা! মা! তুমিও ঐ দলে—মা, তাহলে আমি কোথা যাই,—সমস্ত জগৎটা আমাকে বিদ্রূপ করচে, তার প্রতিধ্বনিতে আমার মর্ম্মস্থল ছিঁড়ে যাচ্চে, আর তুমি—আমার শেষ বন্ধু, তুমিও ঐ দলে!

না, বাবা, আমারি কি ইচ্ছে, তোর যা ভাল লাগে তাই কর... তবে শুধু শুধু বসে আছিস······আর ওরা অমন ঘর······অমন মেয়েটি......আহা!......

না, মা,—আমি কি বিয়ে করবার উপযুক্ত? আমার খেটে খাবার সামর্থ্য নেই, আমার নিজের পেট ভরাবার সামর্থ্য নেই, আমার মায়ের ভরণ পোষণ করবার সামর্থ্য নেই,—আমি বিয়ে করবো?—জমিদারের মেয়েকে?······অসম্ভব! অসম্ভব!

"ঠাকুরপো! তুমি নিজেই অসম্ভব লোক, অমন পেলে আজকালকার বাজার কে ছাড়ে?······" বলিতে বলিতে প্রতিভাদেবীও তরুণের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রতিভাকে আসিতে দেখিয়া উমাদেবী চলিয়া গেলেন।

মেয়েটি রূপেগুণে গুণবতী।

তাতে আমার কি? আমি কি গুণবতীর স্বামী হবার উপযুক্ত?

তা বল্‌লে কি চলে? বয়েস ত হচ্চে।

বয়েস? গরীবের আবার বয়েস? যে নিজের অন্নের সংস্থান কর্‌তে পারে না তার আবার বয়েস? তার আবার বউ? তার আবার প্রেম? গরীবের কিছু নেই,—প্রবৃত্তি নেই, আশা নেই আকাঙ্ক্ষা নেই; যে গরীব, যে উপায়ক্ষম নয়—সে মৃত!......

ও সব লেকচার অনেকেই দিয়ে থাকে,—কাজে ত বড় একটা দেখা যায় না,—কবে তুমি উপযুক্ত হবে তা ত বুঝতে পারিনে।

যবেই হই,—উপযুক্ত না হই, আলবৎ, বিয়ে কর্‌বো না, দেখো, তুমি দেখে নিয়ো।

হাজার হোক, তোমার দাদার মুখপানে চেয়ে এ বিয়েটা করা উচিত ছিল।

আবার সেই কথা—বলি, বিয়েটা ত কর্‌বো আমি? সে দায়িত্বটা ত আমার?

যার এতদিন নুন্‌ খেলে......

কি করবো বলুন, ছোট বেলায় বাপ মরে গেছ্‌লেন, বাবা থাকলে তিনিও তাঁর কর্ত্তব্য কর্‌তেন। অবশ্য দাদা যা করেচেন সে ঋণ অপরিশোধ্য; আমি জীবনে শুধ্‌তে পারবো কি না সন্দেহ। তবে চেষ্টা করবো যদি কখনো তাঁকে সুখী করতে পারি।

পারবে না—কিছুতেই পারবে না। মনেও করো না এমন সম্বন্ধ আর দুটো তোমার জন্যে আসবে। দাদা তোমারি ভালর জন্যে এতখানি এগিয়েছিলেন, তোমারি ভাল হত; আর তোমার ভালও হবে না, দাদাও সুখী হবেন না।

বরাৎ আমার বৌদি!

অমন বড় বড় চাকরীগুলো হাতছাড়া করে বসে আছ,—ভেবে দেখ, এখনো দাদার খাচ্ছ, পাড়ার লোক, দেশের লোক তোমার কত নিন্দে কর্‌চে।

করুক বৌদি—তুমি এখন যাও, আমার কিছু ভাল লাগ্‌চে না; ভাল কথাগুলো বিষ ঠেকচে, আমার সময় মন্দ, আমি হতভাগা……

হতভাগাই ত,—জেনে শুনে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌লে হতভাগা হবে না ত আর কি!

৯

দুঃখীর আর বিরহীর দিন বড় একটা কাটিতে চায় না। কিন্তু আবার আট্‌কায়ও না। নাটক নভেলে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—বাস্তব জীবনে ঐ রকম আশ্চর্য্যের স্থান কতখানি, তাহাও আবার অনেক সমালোচক অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন অনেক অলৌকিক ঘটনা দেখা যায়, যাহা কল্পনারও অতীত। লোকে বলে সাহিত্যে স্বাভাবিকতাই সাহিত্যিকের মহত্ত্বের ভিত্তি। অতি সত্য কথা,—কিন্তু জীবনে স্বাভাবিকত্ব আছে আবার অস্বাভাবিকত্বও আছে,—ভয়ে ভয়ে ভয়ে জুজুর মত জীবনের ঐ অস্বাভাবিকত্বটুকু বাদ দিতে গিয়া অনেক সাহিত্যিকের মাথা খাওয়া গিয়াছে। এত বড় লম্বা চওড়া কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তরুণেরও চাকরী মিলিয়াছে,—ডাকহরকরা লালপাগড়ী মাথায় করিয়া 'তরুণ বাবু' বলিয়া দরজায় ডাকিয়াছে। সে দিন কিন্তু তরুণ অন্যমনস্ক

ছিল। ঠিক সময়ে গলা বাড়াইয়া হরকরার জন্য অপেক্ষা করে নাই। কি একটা কাজ করিতেছিল,—বোধ হয় কবিতা লিখিতেছিল। দেখা যায়, যা আশা করা যায়, তার জন্য বেশী ব্যগ্র হলে তা পাওয়া যায় না। যখন নিরপেক্ষ ভাবে থাকা যায়, সেই সময়ই বাঞ্ছিত বস্তু আপনি আসিয়া থাকে।

তরুণ চিঠি খুলিল বটে,—কম্পিত হৃদয়ে, শঙ্কিত হৃদয়ে, ব্যথিত হৃদয়ে। সে অনেক ধাক্কা খাইয়াছে, একে ত বড় একটা জবাব আসে না,—যদি আসে তবে তাতে লেখা 'দুঃখিত আপনি যে খালি কর্ম্মটার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তরুণ ভাবিল হয়ত তাহাই হইবে। সুতরাং সে বিশেষ ব্যগ্র হয় নাই, অতি উদাসীন ভাবে সে চিঠি খুলিল,—দেখিল চিঠি পুরী হইতে আসিয়াছে।

সেখানে একটী ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র বাহির হইতেছে, তাহার সহকারী সম্পাদক প্রয়োজন। তরুণ যে যে কাগজে মাঝে মাঝে লিখিত সে সব কাগজের 'কাটিং' সংগ্রহ করিয়া দরখাস্তের সহিত পাঠাইয়াছিল। তরুণের চাকরীটি হইল—তাহার একমাত্র কারণ সে চাকরীটীর বেতন অতি কম। মাত্র চল্লিশ টাকা। যাহার অভিজ্ঞতা আছে, বিদ্যাবত্তা আছে, সে অল্প বেতনে কেন বিদেশে ভূতের ব্যাগার খাটিতে যাইবে? আর কর্ত্তৃপক্ষেরা বিবেচনা করিল, চল্লিশ টাকায় এরূপ ত্যাগী কর্ম্মী পাওয়া দায়,—সেই জন্য তরুণের সে চাকরীটী হইল। তাহাতে লেখা ছিল "মহাশয়, আমরা আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে এবং আপনি চল্লিশ টাকা বেতনে "উৎকল বুলেটিনের" সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আপনি আগামী মাসের পয়লা তারিখে আসিয়া আপনার কর্ম্মভার

গ্রহণ করিতে পারেন।” ইতি জগন্নাথ পাণিগ্রাহী, একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

যাই হোক! এইবার তরুণ একটু হাসিল। সাম্‌নে একটা বিরাট স্বপ্নের রাজ্য খুলিয়া গেল,—এই! এইবার! মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া পেট ভরানো! জাতীয়তা গঠন! সমাজ সংস্কার! স্বদেশী ব্যবসার প্রসার! বিশ্বে ভারতের আসন! ওঃ, কত কি! কত কি! সমস্ত দেহটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, পুলকে, আনন্দে, গর্ব্বে, প্রেরণায় দেহখানি ভরপুর হইয়া উঠিল।

‘কিরে, কার চিঠি এলো রে তরুণ’ বলিয়া উমাদেবী আসিয়া হাজির হইলেন।

মা!—মায়ের কাছে ছেলের ভাগ্যের জোয়ার ভাঁটার সংবাদ ওয়্যার-লেসে আসে—মা আপনি জান্তে পারে, ভালটিও পারে মন্দটিও পারে।

মা, আমি চাকরী পেয়েছি, পুরীতে—কাগজের,

কত মাইনে?

তরুণের গর্ব্বস্ফীত মুখখানি লাল হইয়া গেল, অন্তরের ঝঞ্ঝা দমিত করিয়া, কোঁৎ পাড়িয়া, ঠিক সোজা হইয়া, আস্তে আস্তে—মাইনে কি হবে?—মাইনে—মাইনে—এই, চল্লিশ—এই সময় বৌদি আসিলেন,—কি ঠাকুরপো?

উমাদেবী—তরুণের চাকরী হয়েচে।

প্রতিভা—কত মাইনে?

উমাদেবী—কি জানি বাবু, বল্লে’ত চল্লিশ—কি কাগজের চাকরী...

প্রতিভা—ওমা! এরি জন্যে এত কাণ্ড! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে!.....

মহামায়া দেবী অনেক বুঝাইলেন,—কেমন মোটর আছে, কল্‌কাতায় বড় বাড়ী, ইলেকট্রিক লাইট, বিলেত ফেরৎ তরুণ যুবক সুকুমার ব্যারিষ্টার,—কেমন ফুটফুটে দেখতে, কেমন বিয়ে হবে, মোটরে করে স্বাধীনভাবে ব্যারিষ্টারের বউ হয়ে—সে অনেক কথা অনেক রকমের, ভাবের। মহামায়া কি ভাবে কি প্রকারে অলোকাকে নূতন সম্বন্ধের কথা বুঝাইতেছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ কিছু কিছু অনুমান করিয়া লইবেন। অলোকা কিন্তু বড় বড় ডাগর চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া করুণভাবে চাহিয়াছিল। সে করুণ ভাবের চাহনির মানে—"ওগো, আমায় আর জ্বালাতন করো না, আমি বড় জ্বালায় জ্বলছি, মাপ কর, দোহাই তোমার।"

অলোকার বুক জ্বলিয়া পুড়িয়া থাক্ হইয়া গেল—মুখে কথা সরিল না, চোখের পলক পড়িল না, দেহ নড়িল না,—নিষ্পলক নিস্পন্দ চিত্তে অলোকা শুনিয়া গেল। কবি হইলে বলিতাম অন্য কথা,—হয় ত ইউলিসিসের সেই সাইরেন গানের মোহময় ঝঙ্কারের সহিত মহামায়ার বক্তৃতার তুলনা করিতাম,—তফাৎটা এই, ইউলিসিস কাণে কি গুঁজিয়াছিলেন, অলোকা তা করে নাই। অল্পক্ষণ পরেই অমর বাবু আসিয়া ঘোষণা করিলেন, সুকুমার এই রবিবারে নিজে অলোকাকে দেখিতে আসিবে।

কাজেও হইল তাহাই। রবিবারে অমর বাবুর বন্ধু, মহামান্য

হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল হরিচরণ ঘোষ মহোদয়, যিনি অলোকার জন্য সুকুমারের সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন, সুকুমারকে লইয়া আসিয়া হাজির হইলেন।

অলোকার সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই। বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়াছে, ভাবিয়াছে অনেক কথা,—বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছে। অনেকেরই বোধ হয় এই অভিজ্ঞতা আছে—দেখা যায় একটি পাত্র একসঙ্গে একাধিক পাত্রীর প্রেমে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটীরও সঙ্গে বিবাহ হয় নাই,—যাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে সে হয়ত নেহাৎ অকবি, অপ্রেমিকা। কিন্তু আবার দুই এক বৎসরের পর বেশ ভাব হইয়া গিয়াছে। আবার এমন দেখা গিয়াছে, একটী পাত্রী, পছন্দ করিয়াছে একটী পাত্রকে, কিন্তু সে তাহাকে পায় নাই,—যাহাকে পাইয়াছে সে একটা নেহাৎ অপছন্দসই জীব!

অলোকা ভাবিতেছিল একটী কথা,—যদি সুকুমারকে দেখিয়া তাহার পছন্দ হয় তবে কি হইবে?—হাজার পছন্দের মাপকাঠি থাকিলেও বয়েসের দোষে পছন্দটা বড় শীঘ্র হইয়া যায়—এই ত মুস্কিল!

ফলে হইল তাহাই;—অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তাহাতে অলোকা সুকুমারকে নেহাৎ অপছন্দ করিতে পারিল না। তবে ঠিক প্রেমে পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ।

সুকুমার যখন পাড়াগাঁয়ে মেয়ে দেখিতে আসে,—অলোকাকে—তখন মনে ভাবিয়াছিল, সে এক কিম্ভূতকিমার জীব দেখিবে, নিশ্চয়ই অপছন্দ করিবে। অলোকা মাত্র কিছুদিন কলিকাতায় কোন এক স্কুলে পড়িয়াছিল। তাছাড়া যাহা শিখিয়াছিল সবই ঘরে, মায়ের কাছে, বাবার কাছে। বিদ্যের দৌড় যে বিশেষ কিছু তা নয়, বাংলা ইংরাজী সংবাদপত্র,

মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি তাহার বিশেষ লোভনীয় সামগ্রী ছিল,—তাহাই ছিল তার লেখাপড়ার উপাদান। সুকুমার যখন প্রথম অলোকাকে দেখিল, তখনই তাহার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। দেখিল অলোকা একটি লোভনীয় সামগ্রী,—একটি শকুন্তলা,—অনিন্দ্যসুন্দরী, স্নিগ্ধহৃদয়া, স্নিগ্ধনয়না, অতুল্য সৌন্দর্য্যশালিনী। তার উপর আবার সুন্দর মন! সুন্দর কথাবার্ত্তা, অলৌকিক চাহনি!

বেশী কথায় সুকুমারের মনোভাব প্রকাশ করিবার দরকার নাই। যখন অনেক কথাবার্ত্তার পর অমর বাবু ও হরি ঘোষ একটু উঠিয়া গেলেন, সুবিধা যোগে সুকুমার অলোকাকে দু'একটা কথা শুনাইয়া দিয়াছিল।

'অলোকা, যখন প্রথম এখানে আসি, মনে করিনি তোমায় আমি এই পাড়াগাঁয়ে দেখতে পাবো; এতদিনে আমি পেয়েছি, ঠিক যাকে খুঁজেছিলুম······

অলোকা লাল হইয়া গিয়াছিল, কথা কহে নাই, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া ছিল। ভাগ্যিস্ তখনই অমর বাবু ও হরিঘোষ হাসিতে হাসিতে আসিয়া পড়িলেন, তাই রক্ষে! নচেৎ অলোকা ধরণী-দ্বিধা-হও ভাবাপন্ন হইয়া বিশেষ নিপীড়িত হইত।

হপ্তাখানেক কাটিল,—সবাই খুসী, প্রজারা, প্রতিবেশীরা, আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব যেখানে যা আছে।—খুসী নয় শুধু অলোকা,—কি রকম একটু মন-মরা হইয়া থাকে। সেদিন ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি, ইজি চেয়ারটি ছাদে লইয়া গিয়া অলোকা একটু বসিয়াছিল। বসিয়াছিল মাত্র, কিন্তু পোড়া ভাবনাও আসিয়া জুটিল। মনে করিয়াছিল কিছু ভাবিবে না, চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিবে, কিন্তু মন যে একটা উৎকট বিকট জিনিস—বড় বেয়াড়া। সুতরাং অর্থাৎ কাজে কাজেই অলোকা কি ভাবিতেছিল, তাহা একটু জানা দরকার। অলোকা অভিমানিনী, উপেক্ষিত প্রেমের প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষিনী! এত দিন অলোকা জানিত না যে সে একটা সুন্দরী, সে একটা অতুল্য সৃষ্টি! যেদিন দেশান্তর-পর্য্যটন-প্রত্যাগত উচ্চ-শিক্ষিত সুকুমার মুখের সাম্‌নে অত কথা কহিয়া গেল, সেই দিন হইতেই অলোকা বুঝিল সে সুন্দরী। কিন্তু নিজেকে সুন্দরী অনুভব করিয়া সে বিশেষ সুখী হয় নাই, বরং দ্বিগুণ দুঃখিত হইয়াছিল। অলোকা ভাবিতেছিল, বাংলা দেশে তাহার স্বামী হইবার জন্য হয়ত অনেকেই লালায়িত—কিন্তু,—কিন্তু যাহার পাণিগ্রহণের জন্য যাবতীয় ভদ্রযুবক আগ্রহান্বিত, সে হেন সুন্দরী তরুণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে! ওঃ—সয় না! সয় না! প্রাণ ফেটে যায়!—অলোকা ভাবিতেছিল—আহা! তরুণের কোন দোষ নাই, তরুণ তাহার কদর জানিতে পারে নাই। নতুবা তরুণ নিশ্চয়ই তাহাকে ভালবাসিত! সে যে তরুণকে ভাল-বাসিয়াছে,—তাহার উদার বিশাল যৌবনের রঙ তাহার লিখিত মতা-বলীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে!—উপেক্ষিতা!—হাঁ! এতবড় স্পর্দ্ধা!—

তরুণ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে! এর প্রতিশোধ লইতে হইবে,—তরুণকে জব্দ করিতে হইবে। কিন্তু জব্দ করিবে কি করিয়া! সুকুমারকে বিবাহ করিয়া!—কখনই নয়। ক—খ—ন—ই নয়! সুকুমারকে জামাই করিবার জন্য মা, বাবা ইত্যাদি যাবতীয় বন্ধুবর্গ বিশেষ আগ্রহান্বিত—এ যে বড় দায়! কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া বলিবে যে, সে তরুণকে ভালবাসে! তরুণ যে তার শত স্বপনের ধন,—শত জীবনের পণ! কেমন করিয়া বলিবে মনের কথা! বলিলেই বা মা, বাবা কতখানি চটিয়া যাইবেন! অলোকার খাতিরে পড়িয়া বাবা গরীবের হাতে অলোকাকে দিতে রাজী হইয়াছিলেন মেয়েকে সুখী করিবার জন্য। গরীব তাহাকে অবহেলা করিয়াছে, বাবা হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন—ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, অপমানিত হইয়াছেন। এমন সময় সে কেমন করিয়া জানাইবে যে, সে এখনো তরুণকে চায়! জানানো অসম্ভব—যাক্-যাক্—বাবার জন্যই সে সুকুমারকে বিবাহ করিবে,—নিজের সুখকে বলিদান দিয়া! আহা, বাবা যদি তার মনের ভাব জানিত!—বেশ হবে, তরুণ জব্দ হবে! তরুণ ত তাকে চায় না, তবে কেন সে তরুণের জন্য কাঁদিবে? কাঁদিবে না, কিছুতেই না! মেয়ে মানুষ বলে কি কিছুই মনের জোর নেই, নিশ্চয়ই আছে—তরুণকে যে সে ভালবাসে, এ কথাটা সে তাহার একটা কুসংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইবে। অলোকা শুনিতে পাইল, নীচের দালানে বসিয়া মা ও বাবা কথা কহিতেছেন।

শুনেছ গো, হরিঘোষ বল্‌ছিল যে, সুকুমার তার বন্ধুদের বলেচে যে, সে অলোকাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে কর্‌বে না। আর যদি কোন কারণে অলোকার সঙ্গে তার বিয়ে না হয়, তবে সে চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌বে……।

বটে, অলোকা এ কথা জান্‌লে বেশ মজা হয়, যেমন সেই—ছেলেটা, সেই যে গো, তরুণ না কি, তাকে অগ্রাহ্যি করেছিল, তেমনি এবার······।

হাঁ হাঁ, সেই অকালপক্ব ছেলেটির কথা বল্‌চো তো,—সে না কি আবার পুরী গেচে শুনচি,—একটা কি ইংরাজী কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়ে······।

বটে ? আহা ছেলেটি······।

না—না, ওর-কথা আর মুখে এনো না।

অলোকার বুকে শত সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—তরুণ, তরুণ, কোথায় তুমি ! সম্পাদক তরুণ ! পাগল তরুণ ! ঘৃণিত তরুণ !—ওহো সে যে তার বড় আদরের ধন ! পুরী ? পুরী গেছে !—তাকে দেখ্‌বো, একবারখানি দেখ্‌বো, দেশে এত কাছাকাছি থেকে তাকে দেখ্‌তে পাইনি,—ওগো একবার তোমায় দেখ্‌বো—তুমি কেমন সুন্দর, তুমি কেমন বীর, তুমি কেমন যোদ্ধা, কেমন পাগল,—একবার-খানি দেখ্‌বো।

অলোকা আবার শুনিল

বাবা বলিতেছেন :—

সুকুমার বোধ হয় শীগ্‌গীর আর একবার এখানে আস্‌বে, বিয়েটা হয়ে গেলে বাঁচি······।

অলোকার মা মহামায়া দেবী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

১২

রামপুর আর দেবগ্রাম খুব কাছাকাছি, প্রায় এপাড়া ওপাড়া। দেবগ্রামেও অমরবাবুর কিছু কিছু জমিদারী আছে। আপনারা ভাবিবেন না—অমরবাবু খুব একটা জাঁদরেল জমিদার। তবে আজকালকার দিনে তাঁকে বড়লোক বলা যেতে পারে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাঁর প্রতাপ সাধারণ জমিদারের চেয়ে ঢের বেশী, সেটা শুধু তাঁর চরিত্রের গুণে।

যাই হোক, একটি মেয়ে বলেই হোক, আর বড়লোকের মেয়ে বলেই হোক, অলোকা একটু কম কষ্টসহিষ্ণু। জীবনে কখনো দুঃখ পায় নাই—অশান্তি ভোগ করে নাই। কিন্তু এ কি জ্বালা! যে মাসিক পত্রে তরুণের ফটোটি ছিল অলোকা সেটি বড় যত্নে রাখিয়াছিল—রোজ একবার করিয়া দেখিত,—তাহার আশ মিটিত না। মনে মনে কতবার তরুণের সহিত সুকুমারের তুলনা করিয়াছে। সুকুমারের চেহারা রাজপুত্রের মত, তরুণের চেহারা তার কাছে লাগে না,—কিন্তু যেন কি একটা লাবণ্য তরুণের ফটোটিতে ছিল, যাহা শত সুকুমারের সৌন্দর্য্য একত্রীভূত করিলেও পাওয়া যাইবে না;—অবশ্য এটা অলোকার মত, আমাদের নয়।

ভাবিয়া ভাবিয়া অলোকা রুগ্ন হইতেছে, সকলেই সেটা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহার কারণ নির্ণয় করে নাই; খাওয়া কমিয়া গিয়াছে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, মন অত্যন্ত চঞ্চল, মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করে। এতখানি দেহ মন খারাপ, কেউ জানে না, মা অল্প

জান্‌লেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। কাল দুপুর বেলা সুকুমারের আসিবার কথা,—অলোকা সারারাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছে ; সকালবেলা উঠিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে,—খাইতে বসিবার সময় বুক ধড়ফড় করিয়াছে, কাউকে বলে নাই। দশটার সময় খাইয়া নিজের শুইবার ঘরে অলোকা প্রবেশ করিল। অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া কবাট বন্ধ করে নাই। যেমনি সেই মাসিকটা লইয়া সেই ফটোর পাতাটি খুলিল ও বালিশে মাথা রাখিল, অমনি শরীর এলাইয়া আসিল।

তার পর একটু বাদে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিলে আপনাদের অনেকেরই হাসি পাইবে, গ্রন্থকারের নামে দোষ পড়িবে, আর বড় লোকের মেয়ে বলিয়া আপনারা অলোকাকে উপহাস করিবেন। ওমা! ফিট! মরি, মরি! ও কী ঢঙ! অমনি অলোকার ফিট হলো! গ্রন্থকার নেহাৎ উজবুক, নইলে এমনি ঢল ঢল প্রেম যে একেবারে ফিট!

পাঠকবর্গ, আপনারা ক্ষান্ত হউন! আপনারা যদি কেউ অলোকা হইতেন, অলোকার মত ছোটবেলা হইতে প্রতিপালিত হইতেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা, মন, দেহ যদি ঠিক অলোকার মত হইত, ঠিক আপনার এরূপ অবস্থায় ফিট হইত, আমি এককলম লিখিয়া দিতে পারি। যে জীবনে কখনো সমস্যা বা দুঃখে পড়ে নাই, সে যদি ক্রমাগত, দিনরাত একই বিষম বিষয়ে তন্ময় থাকে,—তার ফিট হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। অলোকার ফিট হইয়াছিল, ফিট যদি না হইত তবে ফিটের কথার উল্লেখই করিতাম না।

কিন্তু এধারে সুকুমার আসিয়াছে,—খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গিয়াছে, অলোকার জন্য। মহামায়া দেবী ঘরে গিয়া দেখিলেন, অলোকার

অবস্থা। চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন,—জমিদার-গৃহিণী বলিয়া চাল বজায় রাখিয়া খাতিরের উপর কাঁদিলেন না,—মা যেমন মেয়ের জন্য কাঁদে ঠিক তেমনি। অমর বাবু ছুটিলেন, পাছু পাছু ছুটিলেন সুকুমার ও হরিঘোষ।

দেবগ্রামের অজয়, ঐ যে সেই তরুণের বন্ধু, সে সবে মাত্র কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছে।—ভাল ডাক্তার, অনেক দূরে—আসিতে অন্ততঃ দুঘণ্টা সময় লাগিবে।

'পাঁড়ে—ওরে পাঁড়ে—ও মুকুন্দ—ও ঝি' অমর বাবুর যত চাকর থাকে, ছিল—সব একত্রিত করিলেন।

যাও শীগ্‌গীর—দেবগাঁয়ের সেই ছোকরা আছে—সেই যে নূতন ডাক্তারি পাশ করেচে—সেই যে রে—

হরিঘোষ জানিতেন—অজয়! অজয়!

হাঁ, হাঁ, সেই অজয়কে শীগ্‌গীর ডেকে নিয়ে আয়, বেশী দেরি করিস্‌নি—শীগ্‌গীর যা,—তিন মিনিটের মধ্যে······

কথা শেষ হইবা মাত্র পাঁড়ে, মুকুন্দ, ঝি ছুট দিল,—দিদিমণির অসুখ, সকলেরই প্রিয় দিদিমণি—ওহো, তার অসুখ!

১৩

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অজয় সবে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পাশ করিয়া একটিমাত্র রোগী পাইয়াছিল,—সে হচ্চে পরাশর ভট্টাচার্য্যের মেয়ে। সত্য কলেজ-ফেরৎ, সুতরাং উচ্চাভিলাষী, নূতন ধরণে চিকিৎসা করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিবে বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। অজয়ের মত,—যে ডাক্তার রোগীর মনস্তত্ত্ব দেখে না, সে ডাক্তারই নয়! অজয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া চিকিৎসা করিবে। তাই বলিতেছিলাম, কলেজের বিদ্যে তার মাথায় গিজ্‌গিজ্‌ করিতেছিল। পরাশর ভট্টাচার্য্যের মেয়ের অম্বলের ব্যায়রাম কিছুতেই সারে না। অজয় তখন মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল—বুকজ্বালা করে, মাথা ঘোরে, ক্ষিদে হয় না,—এ সব বাহ্যিক চিহ্ন! অন্তর্জ্জগতের চিহ্ন হচ্চে, তরুবালার বর তাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কি এক অজ পাড়াগাঁয়ে তরুবালার বিয়ে হয়েছিল। এক দিন না কি সে দূরের এক পুকুর থেকে জল আন্‌ছিল, গা ধোয়ার পর। যখন জঙ্গলের সেই মেঠো রাস্তায় আস্‌ছিল, তখন হারু বাঁড়ুয্যের ছেলে কাবু না কি শীষ্‌ দিয়েছিল। এ কথাটা যখন চাপা রইল না, অর্থাৎ যখন তরুবালার বরের কানে গেল, তখনই তাহার বর তরুবালাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সেই থেকেই অম্বলের ব্যায়রামের সূত্রপাত! সুতরাং অজয় পরাশর ভট্টাচার্য্যকে বরাবর পাকে-প্রকারে বলিয়া আসিতেছিল, তাহাকে যেন শ্বশুরবাড়ী পাঠানো হয়। পরাশর ভট্টাচার্য্য অনেক করিয়া, অনেক কৌশল চাতুরী করিয়া জামাইকে

একবার আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর না কি শুন্‌তে পাওয়া পাওয়া যায়, জামাইকে 'তুক্‌' করা হইয়াছিল। সেই 'তুকের' ফলে জামাইটা ভালমানুষ হইয়া গেল, সুড়সুড় করিয়া তরুবালাকে লইয়া গেল। সেই অবধি না কি তরুবালার অম্বলের ব্যায়রাম সারিয়াছে! প্রথম 'কেসেই' অজয় হাতযশ পাইয়াছে ; সুতরাং তার নাম দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। এমন সময় রামপুরের অমরবাবুর বাড়ী থেকে ডাক আসিল। অজয় তল্পিতল্পা গুছাইয়া, সেই পাঁড়ে, মুকুন্দ ও ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল—দিদিমণির ব্যায়রাম!

অজয় যখন আসিল, তখনো অলোকার ফিট্‌। দেখিল, মাথায় অনেক জলের ছিটা দেওয়া হইয়াছে,—বালিস, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। অজয় মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিতে আরম্ভ করিল।

"কিছু ভয় নেই আপনাদের" বলিয়া অজয় সেই মাসিকখানা, যা এখনো অলোকার হাতে ছিল, সেইখানি দেখিতে আরম্ভ করিল, মাসিকের যে পাতাটিতে অলোকা আঙ্গুল দিয়া মুড়িয়াছিল, সে পাতাটি পর্য্যন্ত অজয়কে দেখিতে হইবে।

যাঁহাতক পাতাটা খোলা—তরুণের ফটো! মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যার আশু সমাধান!

মিনিট দু'য়েক পরেই অলোকা পাশ ফিরিল—হাঁপ ছাড়িল! ওঃ অজয়ের যশ আর দেখে কে!

"ভাগ্যিস অজয় এসেছিল, তা নইলে যে কি হতো" অমরবাবু বলিলেন।

ভয় নেই, ভয় নেই, এ যে সব সেরে গেছে—এ কেস্‌ কিচ্ছু সিরিয়াস নয়! তবে কিছু ভাববার আছে।

অলোকার যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হইয়া গেল,—সুকুমার, অজয়, হরি ঘোষ, বাবা, মা, পাঁড়ে, মুকুন্দ, ঝি! ব্যাপার কি!—এঁ্যা! আমার মাসিক! ঐ যে ডাক্তারের হাতে! বাবা, আমার মাসিকখানা দাও……

থাক্, থাক্, আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো, কোন ভয় নেই,—অজয় বলিল।

অলোকা ফিট হইতে উঠিল বটে, কিন্তু মাথা ঘুরিতে লাগিল, আবার ফিট হইবার উপক্রম হইল—লজ্জা!—লজ্জা! লজ্জা!

অজয়—আপনারা একবার আমার সঙ্গে প্রাইভেট রুমে আসবেন কি?

অমরবাবু—নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!

হরিঘোষ—আমাদেরই বা যেতে আপত্তি কি!

অমরবাবু—আপত্তি আর কি! আস্‌তে পারেন, সুতরাং সুকুমারও সেই প্রাইভেট রুমের দিকে ছুটিল। শুধু মেয়েরা, পাঁড়ে, মুকুন্দ, ঝি অলোকার কাছে রহিল।

প্রাইভেট রুমে গিয়াই অজয় মাসিকটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল, বলিল—'এই ফটোটি আপনি চেনেন?'

অমরবাবু, হরিঘোষ—নিশ্চয়ই চিনি!

অজয় তরুণ-অলোকা ঘটিত বিবাহের কথা অনেক দিনই শুনিয়াছে, সুতরাং বলিল—'এ ছবিটি কার'?

অমরবাবু—দেবগাঁয়ের তরুণের।

অজয়—তরুণের সঙ্গে অলোকার বিবাহের কথা হয়েছিল কি?

অমরবাবু অবাক হইয়া গেলেন,—মনে মনে অজয়ের ডাক্তারি-গিরীর বহুত তারিফ্ করিতে লাগিলেন।

অমরবাবু—হাঁ, হয়েছিল।

অজয়—আপনার মেয়ে এ কথা জানে?

অমরবাবু—জানে।

অজয়—ব্যাস্—আমার আর কিছু জান্‌বার দরকার নেই। ওর হার্ট বড় উইক, ওকে চেঞ্জে পাঠাতে হবে। হার্ট ডিজিজের পক্ষে আমার বোধ হয় পুরীই সব চেয়ে ভাল। আপনি হপ্তা খানেকের মধ্যে ওকে পুরীতে নিয়ে যান্—ওখানে অন্ততঃ ছ'মাস ওর থাকা দরকার।

অমরবাবু—বেশ, তাই করা যাবে। তুমি ত আমাদের ঘরের ছেলে, বাবা,—তোমার জন্যেই অলোকা এ যাত্রা রক্ষা পেলে।

অজয়—না—না, ও সব কিছু নয়। আর একটা কথা, অলোকার বিয়ে দেবার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না, অন্ততঃ এক বৎসর।

অমরবাবু—আচ্ছা, তুমি যখন বলচো!

অজয়—দেখবেন, যেন পুরী যাওয়া হয়, অন্য কোথাও যেন না যাওয়া হয়। তাহলে এ কেস যেমন ব্যাপার দেখছি, আপনার মেয়ের রোগ কিছুতেই সারবে না, শেষ পর্য্যন্ত ফেট্যাল্ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অমরবাবু—আমি কালই পুরী রওনা হবো।

অজয় বরাবরই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা কয়,—খোলাখুলি পরামর্শ বা কথাবার্ত্তা ওর কুষ্ঠিতে লেখা নাই। যাহারা চালাক তাহারা অর্থ বুঝিয়া লয়।

অজয় বাড়ীর ছেলে, সুতরাং 'ফি' লইবার অপেক্ষা না করিয়া বরাবর বাড়ীর বাহিরে গেল। পশ্চাতে পশ্চাতে সকলেই গেল। অমরবাবুর মাথা এতখানি খারাপ যে, 'ফি'এর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অন্দর মহলে যাইতেই মহামায়া বলিলেন, 'অজয়কে 'ফি' দেওয়া হয়েচে' ?

এই যা,—এই পাঁড়ে! এই মুকুন্দ! এই ঝি! এই নে টাকা নে,—ঐ যা,—অজয় বুঝি চলে গেল,—যা—যা! দিয়ে আয়, দিয়ে আয়!

অজয় খানিকটা না যাইতে যাইতেই দেখিল, পাঁড়ে, মুকুন্দ ও ঝি পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিতেছে।

অজয়—কি রে! আবার কি!

পাঁড়ে, মুকুন্দ ও ঝি সমস্বরে—এই রূপেয়া, এই টঙ্কা, এই ভিজিটের ট্যাকা!

অজয় ধন্য মানিল! পরাশর ভট্টাচার্য্য পাড়ার ছেলে বলিয়া আর নিজে পাড়ার মোড়ল বলিয়া অজয়কে ভিজিট দেয় নাই, বেয়ারিং পোষ্টে কাজ সারিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অজয় ভিজিট পাইল। কৃতার্থ হইল, জীবনের প্রথম ভিজিট! তরুণ ঘটিত ব্যাপারে! তরুণের প্রতি তাহার যে সব আক্রোশ ছিল, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, তরুণই প্রকৃত মানুষ, কেন না সে তাহার জীবনের প্রথম ভিজিট তরুণ সংক্রান্ত ব্যাপারে পাইয়াছে!

এধারে হরি ঘোষ ও সুকুমার জানিল, এ বৎসর অলোকার বিবাহ হইবে না। সুকুমার হাল ছাড়িল না, অপেক্ষা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। অমরবাবুও বলিলেন, এক বৎসর পরে সুকুমারের সহিত অলোকার বিবাহ হইবে।

কিন্তু কেমন একটা খট্‌কা রহিয়া গেল—অজয় স্পষ্ট করিয়া তরুণের জন্য কিছু বলে নাই,—কিন্তু!—কিন্তু! অলোকা কি তরুণের

প্রণয়-প্রার্থী ? না—না—অলোকা আমাকেই ভালবাসে……যাক……হাল ছাড়িব না……তরুণ কোথাকার কে ? আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে ?

সুকুমার জানিল, বিবাহরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার একটী প্রতিদ্বন্দ্বী আছে।

১৪

এবার তরুণের কথা। তরুণ তাহার মনের মত কাজ পাইয়াছে—দেশের সেবা। সমগ্র বিহারময় 'উৎকল বুলেটিনে'র অসামান্য প্রতিপত্তি। সকলেই জানিত 'উৎকল বুলেটিনের' উড়িয়া সম্পাদকের জন্য নয়,—ঐ যে বাঙ্গালী বাবু সহকারী, উঁহারি জন্য। সহকারী যে ভাবে ইংরাজী লিখিত, যে ভাবে বিহার প্রদেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে মত প্রকাশ করিত, যে ভাবে জন সাধারণকে নূতন নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত করিত, তাহাতে সম্পাদকের কদর শীঘ্রই কমিয়া গেল। জগন্নাথ পাণিগ্রাহী শীঘ্রই দেখিল, বাঙ্গালী বাবু তরুণ এক অসামান্য ক্ষমতাশালী লোক,—বয়েস কম হইলে কি হইবে। সুতরাং একশত টাকা বেতনভোগী উড়িয়া সম্পাদককে বিদায় দিয়া জগন্নাথ পাণিগ্রাহী তরুণকে ষাট টাকা বেতন দিয়া সম্পাদক নিযুক্ত করিলেন। তরুণ এখন 'উৎকল বুলেটিনের' সুযোগ্য সম্পাদক।

দেবগাঁয়ের কালী ঘোষের ছেলে ভুলু, এল-এ ফেল হইয়া অনেক

দিন ধরিয়া বসিয়া ছিল। তরুণ পুরীতে আসিলে সে তাহাকে ঘন ঘন চিঠি লিখিত।—লিখিত "তরুণদা, আমার জন্য যা হয় একটা যোগাড় ক'রো, আমার জীবন দুর্ব্বিষহ হয়েচে" ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন "উৎকল বুলেটিনের' সহকারীর পদ খালি হইল, তরুণ ভুলুকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহাতে কিন্তু পাড়ার সকলেই খাপ্পা হইয়া গিয়াছিল। কালী ঘোষ এক ঘোরে, তরুণ পুরীতে কালী ঘোষের ছেলে ভুলুকে চাকরী করিয়া দিয়াছে—মহাপাতকীর কাজ করিয়াছে। পরাশর ভট্টাচার্য্য তরুণের দাদা অরুণকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "দেখ বাপু, এ সব চল্‌বে না। বেলায় বেলায় সাবধান হও ; নইলে, তোমার ভাইয়ের দোষে, তোমাদেরও সাজা পেতে হবে।"

যাক্ সে কথা। তরুণ কিন্তু একজন বিহারের কর্ম্মী—নামজাদা রাজনৈতিক। বিহারের একছত্রাধিপতি জন-নায়ক—দেবগাঁয়ের পরাশর ভট্টাচার্য্যের মতে, মাতব্বর।

বিহার সরকারের দপ্তর থেকে কড়া কড়া চিঠি আসে, তরুণ অনেক সময় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে,—বিরাট দুর্ব্বলতা আসিয়া হৃদয়কে ছাইয়া দেয়। অনেক দিন হইতে মহামেদপুরের বিরাট কারখানায় কুলীদের মধ্যে চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছিল,—পরিশ্রমোপযোগী বেতনের অভাব, এবং তার উপর কর্ত্তৃপক্ষদের নানা প্রকার অত্যাচার। সেটা কাপড়ের কারখানা, সম্পূর্ণ বিদেশী টাকা ও বিদেশী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এরূপ বেতনের অভাব ও অত্যাচারের কথা সমগ্র ভারত বিদিত। উৎকল বুলেটিনে তরুণ অনেকবার ঐ ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে—অনেকবার নিজেই মহামেদপুরে কুলীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গিয়াছে। বত্রিশ হাজার কুলী

দৃশ্য! না আছে তাদের ভালরূপ থাকিবার ব্যবস্থা, না তাহারা ভালরূপ খাইতে পায়, না তাদের রোগের তত্ত্বাবধান করা হয়।—তাহাদের ছেলে-পুলে কঙ্কালসার, গৃহিণী রোগাক্রান্তা, নিজেরা খাটিয়া খাটিয়া আর ভালরূপ না খাইতে পাইয়া একরূপ নিরাশার ছবিটির মত হইয়া গিয়াছে।—কলেরা ত লাগিয়াই আছে,—বহু-পুত্র-প্রসবিনী কুলীগৃহিণী একটি ক্ষুদ্র অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে রোগ সেবা লইয়া ব্যস্ত আছে। তাহার উপর স্বামীর রোজগারে পেট চলে না। তাহার উপর কলের কর্ত্তৃপক্ষদের নানা প্রকার দারুণ অবিচার অত্যাচার!

তরুণ স্বচক্ষে সব দেখিয়াছে, যতগুলি সর্দ্দার আছে তাহাদের সমবেত করিয়াছে, নানা প্রকার পরামর্শ করিয়াছে ও দিয়াছে। নিজে অনেক সময় সেই কেরোসিন ধূমাবৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে রাত কাটাইয়া রোগাক্রান্ত কুলী, তাদের ছেলে-পুলে, তাদের গৃহিণীদের সেবা করিয়াছে। নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে।—তাহার ক্ষুদ্র আয়ের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সবই তাহাদের অভাব পূরণ করিতে ব্যয় করিয়াছে। তাহাতে হইবে কি? অগাধ সমুদ্রে একটা বিন্দুমাত্র!—তাই তরুণ কম্পিত হৃদয়ে লেখনী ধরিয়াছে। 'উৎকল বুলেটিনে' বত্রিশ হাজার নিপীড়িত মানব সম্প্রদায়ের চোখের জল, তাহাদের অসহনীয় বেদনার কথা জগতের কাছে, ভগবানের কাছে, রাজ সরকারের কাছে, কলের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কাতরভাবে নিবেদন করিয়াছে। তরুণ আজ কর্ম্মী, তরুণ আজ দেশের সেবা করিতেছে, কাঁদিতেছে, কাঁদাইতেছে, কাজ করিতেছে, কাজ করাইতেছে—তরুণ আজ সাধক, বীর!

তরুণ যে প্রেমিক ও কবি, সে কথাটা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। রাজনৈতিক হট্টগোলের মাঝখানেও তরুণ কবিত্ব ফলাইত। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া "কাব্যরসামৃত" নাম দিয়া একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছে। "উৎকল বুলেটিনের" মাত্র ষোল হাজার গ্রাহক। তরুণ জানিত, এই ষোল হাজার গ্রাহকের মধ্যে যে ক'জন বাঙ্গালী কিম্বা বাঙ্গলাভাষা জানে, তাহারা নিশ্চয়ই তাহার "কাব্যরসামৃত" কিনিয়া পড়িবে। কাজেও হইল তাহাই, ছ'মাসের মধ্যে সেই পুস্তকের তিনটি সংস্করণ বাহির হইয়া গেল। শুনা যায় না কি কলিকাতার সাহিত্যিক মহলেও এই পুস্তকখানির খুব আদর হইয়াছিল। তরুণের যতগুলি কবিতা ততগুলি গান,—কিন্তু সব চেয়ে তরুণের নিজের লেখা গানের মধ্যে এইটিই ভাল লাগিত :—

এসেছ তুমি পুষ্পকরথে, অম্বর পথ প্লাবি।
আমার লাগি এনেছ তুমি পিয়ালা সুধা স্রাবি॥
বসে আছি কবে তুমি, আসিবে মরত ভূমি,
কত শত ছায়াপথ, তারকা আসিবে চুমি
পাছে আমি পড়ি ঘুমি, শুধু সখা তাই ভাবি।
সুরভি তুমি এনেছ আজি, অমৃত হৃদে ছাপি॥

উৎকল বুলেটিন সাপ্তাহিক পত্র। কাজ-কর্ম্ম খুব বেশী নয়, বিশেষতঃ যদি একজন সহকারী থাকে। তার সেদিন একটু মেঘলা, তরুণ ২।৩ টার সময় অফিসে একলাটি গালে হাত দিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল,—শুধু টাইপরাইটারের ঠক্ ঠক্ শব্দ, আর পাশের ঘরে

অর্থাৎ সহকারীর ঘরে ভুলুর মাঝে মাঝে খুক্‌খুকে কাশির আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দই ছিল না। তরুণ গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতেছে 'এসেছ তুমি পুষ্পক রথে অম্বরপথ প্লাবি' ইত্যাদি। এরূপ অন্যমনস্ক যখন, তখন সহকারী ভুলু সম্পাদকের কক্ষে প্রবেশ করিল। ভুলু জানিত তরুণের খেয়াল,—কখন কি ভাবে তরুণ থাকিত ফিরিত, কখন তাহার মনের অবস্থা কিরূপ তাহা নির্ণয় করা যাইত না। সুতরাং তরুণকে গুন্‌গুন্ করিতে দেখিয়া বুঝিল, বন্ধুর মেজাজটা খোস্ আছে, সুতরাং কাছে এগোনো যেতে পারে। তরুণ ভুলুকে বন্ধুভাবে দেখিত, কিন্তু হাজার বন্ধু হইলেও সেটা অফিসের বাহিরে, অফিসের ভিতরে নয়। অফিসের বাহিরে ভুলু ও তরুণ একসঙ্গে বেড়াইত, গান গাহিত—একেবারে অন্তরঙ্গ। আবার তারি মধ্যে হঠাৎ কি ভাবিতে ভাবিতে গম্ভীর হইয়া যাইত। ভুলু হাজার স্ফূর্ত্তি করিয়াও তাহাকে স্ফূর্ত্তি দিতে পারিত না। অফিসে ত কথাই নেই,—গম্ভীর—গম্ভীর আর গম্ভীর। হয়ত মেজাজ ভাল, কিন্তু বাহিরে বড়ই গম্ভীর, মোটেই এগুনো যায় না। হয়ত মন খুবই খোলসা, কিন্তু বাহিরে বড়ই ভারিক্যে। ভুলু জানিত, তরুণ এক খেয়ালী বন্ধু,—একাধারে ভাবুক, প্রেমিক, কর্ম্মী, রাজনৈতিক। এহেন বন্ধুর কাছে সব সময়ে সব কথা বলা দায়। কাজেই যখন এহেন গানটি তরুণ গাহিতেছিল—বড় আদরের গানটি— "এসেছ তুমি পুষ্পক রথে, অম্বরপথ প্লাবি।" তখনই ভুলু নিঃসঙ্কোচে তরুণের নিকট অগ্রসর হইল।

কিরে ভুলু?

একটা জরুরী তার এসেছে—মহামেদপুর থেকে।

কি হলো আবার?

'এই দেখ না' বলিয়া ভুলু টেলিগ্রামটি তরুণের টেবিলের উপর রাখিল।

তরুণ আস্তে আস্তে সেটি খুলিয়া পাঠ করিল। তাহাতে শুধু এই কয়টি কথা ছিল।

Crisis ahead, come to-morrow, sharp. সম্মুখে মুস্কিল, কাল আপনি নিশ্চয়ই আস্‌বেন। তরুণ দেখিল, এক নামজাদা সর্দ্দারের নাম তলায় রহিয়াছে।

তরুণ—দেখ ভুলু, কাল তাহলে আমি মহামেদপুরে যাচ্ছি, আর কালই আমাদের কাগজ বেরুবার কথা, তাতে মহামেদপুরের অবস্থাটা একটু বড় বড় হেড লাইনে নিউজ্‌কলমে ছাপিয়ে দিও, এই বোলে যে মহামেদপুরের কুলীরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে,—শুধু এই ভাবে, আর আমি নিজেই একটু সব্‌এডিটোরিয়েল নোট লিখে দেবো'খন—সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই নোটটা আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো, যেন ভুল না—খুব দরকারী, বুঝেছ?

ভুলু সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

তরুণের মুখখানা অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল,—প্রেম ছুটিয়া গেল।

পাঁচটার সময় ভুলু আসিয়া সেই নোটটি লইয়া গেল।

'দেখ ভুলু, আমি একটু সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাব আজ,—একলাটি। যদি বাসায় আমার ফিরতে দেরী হয়, ভেবোনা, বুঝেছ?

আচ্ছা।

ভুলু বুঝিল আজ বন্ধু একলা বেড়াবে, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। মতলবটা এই আর কি!

১৩

তরুণ সটান সমুদ্রের ধার দিয়া হাঁটিয়া চলিল। খানিক দূর আসিয়া, 'সি-বিচ-হাউস' নামে যে সাদা দ্বিতল ভাড়াটিয়া বাড়ীটি সমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার কাছে যাইতে না যাইতেই, দোতলা হইতে হারমোনিয়মের রব শুনা গেল। বাড়ীটি ভাড়াটিয়া বাড়ী, অনেক দিন খালি পড়িয়া ছিল। অকস্মাৎ কোন ভদ্রলোক সেইটি ভাড়া লইয়াছেন। তরুণ শুনিতে পাইল, গানটি বাংলা গান। আরও নিকটে উপস্থিত হইলে গানটি সে স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাইল—মেয়েলী গলা—গানটি এই—'পুষ্পক রথে এসেছ তুমি অম্বরপথ প্লাবি'। তরুণের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। এ কি! সে কি এত বড় কবি যে, তাহার গান প্রাসাদ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে! এ যে তার বড় আদরের গান, যে গানটিকে বড্ডই ভালবাসে—প্রাণ অপেক্ষা। তার হৃদয়-বেদনার সহবেদনাকারী কে এমন আছে, যে বাছিয়া বাছিয়া সেই গানটিই গাহিবে! কে সে?—কে সে? তরুণ চঞ্চল হইল, জগৎটা [illegible]-বাজীর মত প্রতীয়মান হইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না, দূরে একটি বালির ঢিপিতে বসিয়া পড়িল—গানটি শুনিতে হইবে!

তরুণ যখন তন্ময় হইয়া বাহ্য-জগৎকে ভুলিয়া গিয়া বসিয়াছিল, সেই সময় একটা কাণ্ড হইয়াছিল। অমরবাবু সহর হইতে নিজে বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে মহামায়াদেবীও ছিলেন। তরুণ পেছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, অমরবাবু দেখিলেন একটা বাঙ্গালী যুবক পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে, বোধ হয় গান শুনিতেছে। তিনি কিছু বলিলেন

না, মহামায়াদেবীও কিছু না। তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটু বাদেই অমরবাবু অলোকার কাছে গেলেন।

অলোকা, তুই এমন গান গাইছিস্ যে, একটা লোক তন্ময় হয়ে শুনচে...ঐ দেখ্ জানালা দিয়ে, ঐ যে পেছন ফিরে বসে রয়েচে—

বটে? আজও বুঝি এসেছে? কৈ দেখি!

ও-কি রোজ আসে?

না, মাঝে মাঝে আর একটা বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে এই দিক দিয়ে বেড়াতে যায়, আমি রোজ দেখি।

আহা, গান বন্ধ করলি কেন, বেচারা শুন্‌ছিল, বেশ তো!

গান বন্ধ হওয়াতে তরুণ পেছন ফিরিয়া দোতলার দিকে চাহিল, দেখিল একটী অতুল্য সুন্দরী,—সেই পরীদের ঝাঁকের মত, যারা মানস-সরোবরে স্বর্গ থেকে নাইতে আস্‌তো,—তাদের মধ্যে বুঝি একটী কোন গতিকে মর্ত্ত্যভূমিতে আট্‌কে গেছে,—পার্শ্বে একটি বৃদ্ধ লোক, বোধ হয় সেই মেয়েটীর বাপ।

এধারে অলোকা গান থামাইয়া জান্‌লার কাছে আসিতেই দেখিল, তরুণ মুখ ফিরাইয়াছে, দূর থেকে চোখোচোখি হলে যেমনটা হয়, ঠিক তেমনটি হইল। অলোকা দাঁড়াইতে পারিল না, আসিয়াই ইজিচেয়ারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে মহামায়াদেবী আসিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইলেন, 'ওমা, ওকে যেন দেখেছি মনে হচ্চে,—হ্যারে অলি, সেই যে তোর মাসিকে ওর ফটোটা ছিল না·····...সেই যে রে!

অলোকা লজ্জায় মরিয়া গেল, নিজেকে সংযত করিল, সাহস সংগ্রহ করিল, জোরের সহিত বলিয়া ফেলিল—কেন, জান না? ও যে তরুণ!

অমরবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন—বটে? বটে? সেই যে অরুণের ভাই, যার সঙ্গে অলোকার বিয়ের কথা হয়েছিল?

মহামায়াদেবী—হাঁ!

অমরবাবু—ওরে পাঁড়ে, ওরে মুকুন্দ!

পাঁড়ে ও মুকুন্দ আসিয়া হাজির হইলে, অমরবাবু বলিলেন—"দেখ্ তো, বাইরে যে ভদ্রলোকটি বসে আছে, তাঁকে একবার ডাক্‌তো! বল্‌গে যা, বাবু আপনাকে একবার ডাকচেন, আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বেন—বল্‌বি এখানে বাঙ্গালী-টাঙ্গালী নেই, তাই জন্যে বুঝলি?"

দুই জনেই ছুট দিল।

এধারে জানলার কাছে গিয়া অমরবাবু দেখিলেন,—তরুণ নাই, উঠিয়া গিয়াছে, একটু পরেই পাঁড়ে ও মুকুন্দ আসিয়া খবর দিল; "কই বাবু, কাউকে দেখ্‌তে পেলুম না।"

তরুণ অপ্রতিভ হইয়াছিল। পাগল লোকেদের যেমন হয়। মনে করিল, সে অত্যন্ত অভদ্রতার কাজ করিয়াছে,—এরূপ বসিয়া থাকা তাহার নেহাৎ অন্যায় হইয়াছে। সুতরাং সে ভীরু ও কাপুরুষের মত ছুট দিল—পলায়ন করিল, দূরে, সেই দূরে—একলাটি!

চারিধারে লোকালয় নাই,—সম্মুখে সমুদ্র, সন্ধ্যা ঘোরাল হইয়া আসিতেছে, তরুণের মনে ঝড় উঠিয়াছে,—বিদ্যুৎ হানিতেছে, বজ্র কড়মড় করিতেছে! কাল সে মহামেদপুরে যাইবে! একধারে দেশের সেবা,—কর্ত্তব্য! একধারে সেই গানের নেশা! আর একবার শুন্‌তে হবে, খুব লুকিয়ে! বীর সময়ে সময়ে কাপুরুষ হয়, আজ তরুণের অবস্থাও ঠিক তাই!

তরুণ ভাবিতেছিল—মেয়েটি কি খৃষ্টান!—না ব্রাহ্ম। না ব্রাহ্মণ

ছাড়া অন্য কোন জাত! স্বপ্নের সুরভির মত অতুল্য মায়াজাল ছড়িয়ে কেমনটি দাঁড়িয়েছিল! কেমন বড় বড় চোখ! কত ভাষা, কত কাহিনী! তাহার মনের অগাধ অনাবিল সৌন্দর্য্যটুকু চোখ দুটির ভিতর দিয়া কেমন ফুটে উঠেছিল! ঐ রকমটি যদি তার প্রণয়িনী হয়—পুষ্পক রথে অম্বর পথে ওই-ই এসেছে!

তরুণ ভাবিতেছিল—আমি ত সমাজের ভয় করি না! প্রেম গোত্র গণ্ডীর বাহিরে, ও'ত মানবের সংস্কার-নির্দ্দিষ্ট সীমার ক্রীড়নক নয়! আমি অনেক দিনই সমাজের চক্ষুশূল, তবে কিসের ভয়? আমি তার প্রণয়-প্রার্থী হবো,—তাই বা হই কি ক'রে—ওযে বড়, আমি যে ছোট—না, না. প্রেম বড়-ছোটর তোয়াক্কা রাখে না,—যদি উপেক্ষিত হই, ওরই স্মৃতিটি বহন করে জীবনটা কাটিয়ে দেবো—আমার গান?—পুষ্পক রথে এসেছ তুমি······?

সাম্‌নে :অনাদির উন্মুক্ত উদারতা, সাগরের পুলকময় ঐক্যতান, ঊর্দ্ধে দু'একটী তারা উঁকি মারিয়া উঠিল, বিশ্ব-সৃষ্টির অতুল সৌন্দর্য্য মর্ম্ম-লাঞ্ছিত হৃদয়ে উৎসাহের ভাব সিঞ্চন করিয়া দিল—এই ত মানুষ! ক্ষুদ্র ভীরু!—ভয় নেই, হলেমই বা সমাজদ্রোহী, কুৎসিতদ্রোহী—হে অনন্তশাসন! যেন জীবনে কখনো সত্যদ্রোহী না হই...।

মহামেদপুরে গুলি চলিয়াছে। বিদ্রোহী কুলীদের শাসনে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। পুলিশ সে জনতায় শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত যাহা করিবার সবই করিয়াছে। উভয় পক্ষের বিস্তর লোক হতাহত হইয়াছে। তবে কুলীদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তরুণ যখন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তখন যা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। কুলীদের সর্দ্দার বুধুয়া তরুণের পা ধরিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যা শুনিবার সমস্তই তরুণ শুনিল। এখন পুলিশ ও কলের সাহেবদের যাহা কিছু বক্তব্য তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কাজেই ধীরপদবিক্ষেপে পুলিশ-দলের কর্ত্তার নিকট তরুণ হাজির হইল। পার্শ্বে কলের দু'চারিটি সাহেবও ছিল। তরুণকে দেখিয়া তাহারা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—মনে করিল, এ জীব আবার তদন্ত করিতে আসিতেছে। হাসির মানে আছে। তরুণ তৎক্ষণাৎ বন্দী হইল, হাতে লোহার বালা পড়িল। তরুণ কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বুঝিল, যে সে-ই কুলীদের উস্কাইয়া দিয়া এ কাণ্ড বাধাইয়াছে,—এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তরুণের লেখনী, তরুণের ঘনঘন মহামেদপুরে যাতায়াত, তরুণের কুলীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাব,—এই সবই এই হত্যাকাণ্ডের মূলীভূত কারণ। তরুণের কিছুই বলিবার ছিল না।

তরুণকে বন্দী হইতে দেখিয়া, কুলীদের প্রাণে আবার এক নূতন সাড়া পড়িল। তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এধারে আবার আগ্নেয় অস্ত্রও গর্জ্জিয়া উঠিল। তরুণ হাত দেখাইয়া কুলীদের

হটিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। তরুণের ইঙ্গিত পাইয়া সেই কুলীদের বিরাট জনতা আর অগ্রসর হইল না। পুনরায় আর রক্তপাত হইল না। রাজ-সরকারের সমগ্র ক্রোধ, মহামেদপুরের কলের সাহেবদের সমগ্র ক্রোধ, তরুণের উপর পড়িল। আজ তরুণ আর শুধু সমাজদ্রোহী নহে, কুৎসিতদ্রোহী নাই, আজ তরুণ রাজদ্রোহী! তরুণ বিদ্রোহী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বিদ্রোহীর পরিণাম যিশুখৃষ্টের মত—পেরেকের ঘা খাইয়া কাঠের ক্রুশে লটকাইয়া থাকা—তিল তিল করিয়া ইহ-জগতের রক্তমাংসকে বলিদান দেওয়া। জীবনভোর পরের জন্য কাঁদিয়া, পরের হাতে নিপীড়িত হওয়া। সুতরাং তরুণের এ ব্যাপারের মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। যাহা স্বাভাবিক তাহাই হইয়াছে।

থাক্ সে কথা। এখন তরুণের এই বন্দী হওয়ার সংবাদ যখন 'উৎকল বুলেটিন' অফিসে আসিল—কুলীরা অবশ্য 'তার' করিয়াছিল—তখন জগন্নাথ পাণিগ্রাহী বিশেষ বিচলিত হয় নাই। তা হইবে কেন? এক সম্পাদক গেলে আর এক সম্পাদক পাওয়া যাইবে। আর কাগজের সম্পাদক বন্দী হইলে সেই কাগজের বিক্রয় বাড়ে বই কমে না। কাগজের বাজার আক্রা হইয়া উঠিল। সেই সপ্তাহে চারটি 'এডিসন' অর্থাৎ সংস্করণ বাহির করিতে হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার পাঠক 'উৎকল বুলেটিন' পড়িবার জন্য প্রতি সপ্তাহে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল।

তরুণের অনুপস্থিতিতে ভুলু কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। জগন্নাথ পাণিগ্রাহী ভুলুকে সেই সম্মানের আসনে বসাইতে তিলমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই।

তরুণ বন্দী হওয়ায় ভুলু কাঁদিয়াছিল। লুকাইয়া, দেখাইয়া।

ভুলু ছিল চিরকেলে ভীরু। একঘোরের ছেলের সাহস আর কতখানি! সমাজ যাহার মাথা খাইয়াছে, তাহার আর স্থান কোথায়? তা ছাড়া, ভুলু একটা অসাধারণ কিছু নয়, তোমার আমার মত একটি জীব। দশজনকে ভয় করিয়া চলা ছাড়া ভুলুর জীবনে নিজের ব্যক্তিত্ব দেখা-ইবার সুবিধা বড় একটা ঘটিয়া উঠে নাই। তবে এখন সে অন্য রকমের। সে তরুণকে ভালবাসিত, পূজা করিত, তরুণ তাহার প্রাণ। ভুলুর সুপ্ত মনুষ্যত্ব সহসা জাগিয়া উঠিল। যে প্রেরণা তরুণকে এত দিন পাগলের মত বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে অনবরত ঘুরাইয়া মারিয়াছে, সেই প্রেরণা অকস্মাৎ ভুলুর হৃদয় অধিকার করিল। দ্বিগুণ উৎসাহে ভুলু কলম ধরিল। বড় বড় "হেড লাইনে" তরুণের বন্দী হওয়ার কথা ত্রিশ হাজার গ্রাহককে জানাইল। তরুণের স্বার্থত্যাগ, মহাপ্রাণতা, দোষ-হীনতা, সমগ্র বিহারকে জানাইল। রাজ সরকারে নিবেদন করিল, প্রমাণ করিল তরুণ সম্পূর্ণ নির্দোষ। ভুলু এত দিন সহকারী ছিল, তাই তার কদর বুঝা যায় নাই। এখন সে দশজনকে বুঝাইল, তরুণের পদে কিছু দিন কাজ করিবার অধিকার তাহার আছে।

তরুণ বন্দী হওয়ায় সবচেয়ে স্ফূর্তি হয়েছিল অলোকার। অমন হাসি, অমন উৎফুল্লতা বোধ হয় আর কখনো তাহার দেখা যায় নাই! হৃদয় এতখানি স্ফীত হইয়াছিল। রাণীর মত ধীর পদক্ষেপে পায়চারী করিতে করিতে সে পিতার নিকট হইতে 'উৎকল বুলটিনের' সেই প্রেরণাময় ঘটনানিচয় শুনিত।

সেদিনকার কাগজে ছিল,—তরুণকে বন্দী করিয়া পুরীতেই আনা হইয়াছে।

শীঘ্রই তাহার বিচার আরম্ভ হইবে। তরুণের জন্য এক উড়িয়া উকীল ভুলু নিযুক্ত করিয়াছে।

কথাটি শুনিতে শুনিতে অলোকার যেন কি মনে পড়িল! হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—

বাবা!

কেন অলি!

বলি বলি করিয়াও কথাটি অলোকার ঠোঁটের অগ্রভাগে রহিয়া গেল। লজ্জায় গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আবার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া গেল,—ছলছল করিতে লাগিল। সমগ্র দেহ বিচলিত হইল।

কি মা, কি বলছিস্?

বাবা—বলছিলুম কি—ইয়ে হয়েচে।

কি!

ইয়ে,—আমরা কি তরুণ বাবুর কিছু উপকার কর্‌তে পারি না ?

কি উপকার বল্‌ !

এই—তরুণ বাবুর জন্য সুকুমারকে টেলিগ্রাম্‌ কর্‌লে ত হয় !

অমরবাবু হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কেন সুকুমার—কি করবে ?

কেন ? তরুণ বাবুকে রক্ষা কর্‌বে।

কি সাধ্যি তার যে, সুকুমার তরুণ বাবুকে রক্ষা করে ?

কেন, নিশ্চয়ই পার্‌বে ! আমি বল্‌চি, আপনি আমার কথার ওপর নির্ভর করে, সুকুমারকে টেলিগ্রাম্‌ করে দিন,—সে এসে নিশ্চয়ই জিতবে,—তা নইলে তরুণবাবুর নিশ্চয়ই জেল হবে।

তুমি কি নিজেকে এতই বুদ্ধিমতী বিবেচনা কর ?—এরকম স্থলে সুকুমার তরুণবাবুকে বাঁচাতে পারে ?

হাঁ।

আচ্ছা, তা আমি কর্‌তে পারি, কিন্তু—তরুণবাবুকে রক্ষে করে তোমার লাভ ?

কেন, আপনার মায়া হয় না ?

মায়া ? ওর ওপর আবার মায়া ? একটা সৃষ্টিছাড়া মাথা পাগ্‌লা ছোকরা—

বাবা !

নিজের বুদ্ধির দোষে—জানো আমি ওর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ প্রথম করেছিলুম ?—কিন্তু এখন দেখছি ওটা একটা আস্ত—

বাবা ! আপনি আমার কথা রাখবেন না ?

এই সময় মহামায়া দেবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মহামায়া দেবী দেখিলেন, অলোকার চোখের কোণে ক্ষীণ অশ্রু-কণা, আর দেখিলেন অমরবাবুর ক্ষুব্ধ মুখখানি। অলোকা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে, মহামায়া দেবী সব নিবিষ্টচিত্তে শুনিলেন।

মহামায়া দেবী—বেশ ত, অলির কথা রাখ্‌তে দোষ কি ?

অমর বাবু—মাথা নেই, মুণ্ডু নেই,—কেন আমি অযথা সুকুমারকে বিরক্ত করব ?—আর তাকে ত অমনি খাটালে চল্‌বে না, টাকা চাই।

টাকা আমি দেব।

বেশ, তুমি যদি টাকা দাও, তবে তুমিই টেলিগ্রাফ্ কর, আমি এসব ছেলেমানুষিতে আর নেই।

আচ্ছা, তবে এই কথাই রইল,—আমি টেলিগ্রাফ্ করে সুকুমারকে আন্‌বো, আমিই এসব খরচ দেব।

দেখচি, তোমারও মাথা খারাপ হয়েচে। আমাকে বল্‌তে পারো, কেন তোমরা এরকমের ষড়যন্ত্র করচো ?

এখন পার্‌বো না, এর পরে বলব।

কেন, তোমার বল্‌তে বিশেষ আপত্তি আছে ?

আপত্তি আর কি—শুদ্ধ তোমার মেয়েকে সুখী করবার জন্যে।

তোমার এ হেঁয়ালী বুঝতে পারলুম না।

এখন বুঝেও কাজ নেই তোমার।

মহামায়া দেবী উঠিয়া গেলেন। অমর বাবু অর্থহীন একটা হাসি হাসিলেন।

১৯

এক দিন বাদেই স্থকুমার আসিয়া হাজির। অমরবাবু বলিলেন, এ টেলিগ্রাফ্ করার জন্য দায়ী তিনি ন'ন। অলোকার মায়ের কাছে গেলে ইহার নিষ্পত্তি হইবে। অগত্যা স্থকুমার মহামায়া দেবীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, অলোকার কাছে গেলে সব খবর পাওয়া যাবে। স্থকুমারের মস্তিষ্ক ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছিল,—এই অকস্মাৎ টেলিগ্রাফ্ পাইয়া! আবার এই টেলিগ্রাফ্ করার কারণ অলোকা ছাড়া আর কেউ জানে না! অলোকা নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া সেইদিনের 'উৎকল বুলেটিন' পড়িতেছিল। স্থকুমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই যেন অলোকার ভাবপ্রবাহে সহসা বাধা পড়িল,—মুখ চূণ হইয়া গেল,—একটা বিরাট কালিমা সমগ্র মুখমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলিল। অলোকার সেই ভাব দেখিয়া স্থকুমার এক মিনিট কথা কহিতে পারে নাই। অলোকা নিস্পন্দ, নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু দূরের সমুদ্রের দিকে একবার চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরেই অলোকা চেয়ার হইতে উঠিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল "আস্থন, স্থকুমারবাবু যে! বস্থন, ঐ চেয়ারে বস্থন।"

অলোকার ভাব গতিক দেখিয়া স্থকুমার অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মাথায় কিছু ঢুকিতেছিল না, পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে স্থকুমার চেয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

আমাকে আসবার জন্য টেলিগ্রাফ কি আপনি করেছেন?

হাঁ।

কেন, বলতে পারেন, আমি বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়েচি,—আপনার বাবা ও মা কিছুই বলতে পারলেন না।

বটে? তাঁরা কিছুই জানেন না?

না।

ওঃ—তবে আমিই জানি!

বলুন, আমার আর মোটেই বিলম্ব সইচে না।

ব্যস্ত হবেন না, বলবার জন্যই আমি আপনাকে টেলিগ্রাফ্ করে আনিয়েচি,—আমি সব বলচি—

এই বলিয়া অলোকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

প্রায় আবার পাঁচমিনিটকাল অলোকা চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবগতিক দেখিয়া সুকুমার আবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

কারণ? কারণ তাহলে একান্তই শুনবেন?

হাঁ—শুন্‌বো বৈকি!

আমি একান্ত পাষাণ—আমি নির্ম্মম!

কেন? ছি ছি! ও কথা বলচেন কেন, আপনি ত ওরকমটি নন্!

হাঁ—নই বটে, তবে কিছুদিন থেকে হয়েচি,—সুকুমারবাবু!

বলুন।

আপনি কি আমায় যথার্থই ভালবাসেন?

সুকুমার এ কথার কি জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। একবার মনে হইল অলোকা তাহার সহিত বিদ্রূপ করিতেছে আবার মনে হইল, নিশ্চয়ই এরূপ হওয়ার বিশেষ কিছু কারণ আছে। কিছুক্ষণ পরে সুকুমার বলিল,

আপনার ও কথা জিজ্ঞাসা করার মানে?

আমার ঠিক সন্দেহ হয়, তাই জিজ্ঞাসা করচি।

হাঁ, আমি আপনাকে—

বাধা দিয়া অলোকা বলিল—ঠিক, ঠিক বলচেন ?

হাঁ।

তবে আপনি কি আমার জন্য কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে পারেন ?

নিশ্চয়ই, একশো বার !

এখানে একটি ভদ্রলোক—তরুণবাবু—সেই যে আমাদের দেশের —তাকে বোধ হয় আপনি চিনতে পার্ব্বেন—

হাঁ—হাঁ—

তিনি বড়ই বিপদে পড়েচেন।

অলোকার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল।

বলুন—সবিশেষ খুলে বলুন।

তিনি এখানকার এক কাগজের সম্পাদক ছিলেন, সহসা কোন কারণে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বন্দী হয়েচেন। সবিশেষ সবই বলচি, তাঁর কাগজ এখনো চলচে, তাহতে সবই আপনি টের পাবেন—তাঁকে, সেই তরুণবাবুকে উদ্ধার করতে হবে—করবেন কি ?

বড় সমস্যার কথা !

দেখুন, সমস্যার কথা টথা আমি জানি না—আপনাকে আজ এই দায়িত্বটুকু দিলাম—শুধু আপনি আমায় ভালবাসেন বলে ! তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে !

আমি চেষ্টা করবো, ঠিক বলতে পারি না, বিচারে কি দাঁড়ায় !

আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না,—আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে।

আচ্ছা, আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

করুন !

আপনি তরুণ বাবুর জন্য অত ব্যস্ত হচ্চেন কেন ?

অলোকা সহসা আঁচল দিয়ে মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল।

২০

তরুণের বিচারের আর মাত্র দুই দিন বাকী আছে। তরুণের এই বিচার দেখিবার জন্য তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে লোক পুরীতে আসিতেছিল। বাঙ্গালী, বেহারী, উড়িয়া, মান্দ্রাজী, বম্বেওয়ালা, পাঞ্জাবী! তরুণ আজ স্থানবিশেষের রাজনৈতিক গণ্ডী ছাড়িয়া, ভারতজোড়া ভাবপ্রবাহের প্রতিনিধি হইয়া, একটা সার্ব্বজনীন প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। ভুলুর কলমের জোর অত্যন্ত বাড়িয়াছে, এখন সে মরিয়া। পুরীর পথে ঘাটে ভারতের শ্রেণীবদ্ধ সন্তান ধীর পদক্ষেপে ফিস্‌ফাস্ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে বিচরণ করিতেছে। কখনও কখনও বা দেশের তরুণ-হৃদয় "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত করিতেছে।

তরুণ জেলের কক্ষে আনমনা বসিয়াছিল। মুখে কোনরূপ উদ্বিগ্নতার চিহ্ন ত ছিলই না; পরন্তু একটা প্রশান্ত ভাব লক্ষিত হইতেছিল। সুকুমার তরুণের তরফের ব্যারিষ্টার হইয়া তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছিল।

কক্ষের কবাট খুলিতেই তরুণ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল—দুইটি জীব, একটি সাহেব ও অপরটি বাঙ্গালী। প্রথমটি জেলার ও দ্বিতীয়টি সুকুমার। জেলার সুকুমারকে পৌঁছাইয়া দিয়া তফাতে সরিয়া গেল।

তরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বসুন, আপনার ওঠ্‌বার কোন দরকার নেই। আমার নাম সুকুমার রায়, আমি ব্যারিষ্টার। আপনার জন্য আমি নিযুক্ত হয়েছি, তাই একটু পরামর্শ কর্‌তে এসেছি মাত্র।

কেন পরামর্শ ত হয়ে গেচে! এখানকারই একজন উড়িয়া উকিল আমার তরফ থেকে নিযুক্ত হয়েচেন,—তাঁর সঙ্গে সবিশেষ সব কথাই হয়ে গেচে···

বটে? তা ত আমি জানি না! অলোকা আমায় কল্‌কাতা থেকে টেলিগ্রাফ্‌ করে আনিয়েচেন—পরে বুঝলাম আপনারি জন্যে।

কে? কে, আনিয়েচেন আমার জন্যে?

অলোকা!

অলোকা? অলোকা কে? কই আমি ত তাঁকে চিনি না, আপনি কি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করতে জেলে এসেচেন? অলোকা, নামে বোধ হয় তিনি নিশ্চয়ই স্ত্রীলোক!

হাঁ, তিনি স্ত্রীলোক,—কি আশ্চর্য্য! আপনি তাঁকে চেনেন না!

না।

দেখুন তরুণবাবু, আপনি আমাকে ইনসাল্ট কর্‌চেন।

ইন্‌সাল্ট? ইন্‌সাল্টের মানে আমি বুঝলুম না।

অলোকা,—যিনি সি-বিচ্‌-হাউসে রয়েচেন এখন—

ওঃ—সেখানে ত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ভাড়াটে এসেচেন—

অলোকা তাঁরই মেয়ে। কি আশ্চর্য্য! অলোকা আপনার জন্যে পাগল, আর আপনি তাঁর নাম পর্য্যন্ত জানেন না!

ওঃ—এবার কতকটা বুঝেচি !

তরুণ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। হৃদয়ের শত সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—মনে হইল না সে আর সেই জেলে আছে—মনে পড়িল সেই মর্ম্মরিত, ফেনিল সাগরের বিরাট ঐক্যতান, সেই সোণালী গোধূলির ফাগে ধোয়া স্বপ্নঢালা রঙ—আর, আর সেই অলোকা-কণ্ঠ-নিঃসৃত সেই সন্ধ্যার দিগন্তপ্লাবী—সেই, সেই গান !—পুষ্পকরথে এসেছ তুমি অম্বরপথ প্লাবি !—ওঃ—অলোকা কি আমায় ভালবাসে? এঁ্যা !—ভালবাসা কি ?

সুকুমারবাবু ! আমায় মাপ করবেন,—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

হাঁ পারেন—করুন।

অলোকা আপনাকে আমার জন্য পাঠালেন কেন ? কেন ? তাঁর কি এমন স্বার্থ থাকতে পারে,—আপনি কি কিছু জানেন ?

আজ্ঞে না—আমি কিছুই জানি না।

আপনি কিছু কারণ অনুমান করতে পারেন ?

না, বরং আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্চি।

অলোকা কি আপনার কেউ হয় ?

না।

তবে ?

'মাত্র পরিচিত' বলিয়াই সুকুমার একটু লজ্জার ভাব দেখাইল।

কি রকম—আমাকে বলতে আপনার আপত্তি আছে কি ?

না, আপত্তি আর কি, অলোকার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েচে—.

তরুণ বিবর্ণ হইয়া গেল, যেন সকল স্বপ্ন সহসা ভূমিসাৎ হইয়া গেল। নিজেকে সংযত করিয়া তরুণ বলিল—ওঃ, তা বেশ! আমার—এই গরীবের জন্য তাঁর এত চিন্তার কারণ কি বলতে পারেন?

না—তা ঠিক পারি না।

তবে, আপনি যেতে পারেন। উপস্থিত আপনার সাহায্য আমি আবশ্যক বোধ করি না,—আসুন, তবে—

২১

অলোকা ব্যগ্রভাবে সুকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মনে করিয়াছিল, বিপদের সময় এরূপ সাহায্য কখনই উপেক্ষিত হইবে না,—অন্ততঃ এই সূত্রে তরুণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা সুরু হইতে পারে। হায়! অলোকা আর যাহাই হউক, সামান্য বালিকা মাত্র!

কিন্তু অলোকার নিভৃততম অন্তরের কোণে একটা খট্‌কা কেমন করিয়া যেন জাগিয়া উঠিয়াছিল। অলোকা তরুণকে জানে,—বেশ ভাল করিয়াই জানে,—কিন্তু বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তরুণ, অলোকা যে কে তা জানে না। অলোকা জানিত না সুকুমার একটা মস্ত ভুল করিবে। ভুল করিবে এই হিসাবে যে—অলোকা রামপুরের জমীদার অমরবাবুর মেয়ে তাহা বলিবে না,—শুধু বলিবে—অলোকা!—একটা অবিবাহিত বন্দী যুবক; তার কাছে বাপ-মা বর্ত্তমানে নিজে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া জেলে পরামর্শ করিবার জন্য পাঠাইয়া

দিয়াছে কি না—এক অপরিচিতা অলোকা! যার সঙ্গে কখনো আলাপ নাই! এ যে বড় অসঙ্গত কথা! মেয়েটির বাপ মা আছে, তাহাদের মাথা কামড়াইল না,—আর লুকাইয়া বোধ হয় এই সব কাণ্ড হইতেছে,—এসব জিনিস যেন তরুণের কাছে কেমন একরকম খাপছাড়া বোধ হইল। স্বাধীনচেতা তরুণের মনুষ্যত্বকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল—তরুণ অবমানিত মনে করিল,—কিন্তু ভিতরকার রহস্য কিছুই বুঝিল না।

সুকুমার তার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট অলোকার সাহায্য লইয়া গিয়াছে,—সুকুমার যেন এটা বুঝিয়াছিল।

'কি আশ্চর্য্য! আপনি তাকে চেনেন না!'

সুকুমারের এই কথাটা বড়ই অপমানসূচক। সে যদি বলিত, অমর-বাবু রামপুরের জমীদার,—অলোকা তাঁর মেয়ে,—পুরীতে হাওয়া বদলাতে এসেচেন,—তা হলেও তরুণ এরূপ সময়ে অলোকাকে চিনিতে পারিত কি না তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

তার পর তরুণ যখন শুনিল, এরূপ অযাচিত সাহায্য প্রেরণ অর্থহীন,—অলোকা খামকা এরূপ কাণ্ড করিতেছে—তার উপর সুকুমারের সঙ্গে তার বিবাহের কথা হয়েচে, এইসব ঘটনাবলী,—আর তার সেই লুকিয়ে সাগর সৈকতে বসে গান শুনা,—তরুণের মনকে একেবারে নিস্তেজ করিয়াছিল।

সুকুমার রাগান্বিত ভাবে অলোকার কক্ষে প্রবেশ করিল।

কই!—তোমার—তোমার তরুণবাবুর জন্যে এত কাণ্ড, তিনি ত আমায় দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। তোমার জন্যেই এই অপমানটা সইলুম। অন্য কেউ হলে, আমি রীতিমত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতুম!

অলোকা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে, বেদনায় মুসড়িয়া গেল।

সুকুমারবাবু!—

ছি ছি! তোমার মাথায় এসব পাগলামী ঢুক্‌লো কি করে। তরুণ কে তোমার সাত পুরুষের—একটা অসভ্য গোঁয়ার—

দেখুন, সুকুমারবাবু, আপনি বেশী কথা কইবেন না। ইচ্ছে হয় আপনি এ 'ব্রীফ' নিন্—না হয় কল্‌কাতায় ফিরে যান,—আপনার মুখে আমি ওরকম কথা শুন্‌তে চাই না।—আপনি এ কেসের জন্য টাকা পাচ্চেন মনে থাকে যেন,—ব্যাগার কাজ নয়!

অলোকা! এ কি!—তোমার মুখে এ কি কথা! তুমি কি মনে কর টাকাই আমার সব? আমি জানি সব চেয়ে—

থাক্,—আপনাকে তরুণ বাবু কি বল্লেন?

তিনি আমাকে ইন্‌সাল্ট করেচেন।

ইন্‌সাল্ট? বিশ্বাস হয় না!

তিনি ত তোমায় চিন্‌তেই পারলেন না!

বটে?

তার চেয়ে আর বেশী কি ইন্‌সাল্ট মানুষে মানুষকে কর্‌তে পারে?

হাসিয়া অলোকা উত্তর করিল, বাস্তবিকই ত তিনি আমায় চেনেন না! তিনি তোমার সাহায্য নিতে অস্বীকার করেচেন, করুন, কিন্তু আপনাকে কোর্টে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে,—হয়ত আপনার সাহায্য দরকার হতে পারে।

অমরবাবু এই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি সবিশেষ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,

আচ্ছা, সখ্ তোমার অলি,—কেন এসব ছেলেমানুষি!

অলোকার জেদ দেখিয়া সকলেই হাসিল—হাসিলেন অমরবাবু,—মহামায়া দেবী, আর হাসিল—সুকুমার।

সুকুমার বেচারী ব্যস্ত হইয়া ভালবাসার খাতিরে সেইমত কাজ করিল বটে, কিন্তু নেহাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

২২

আজ বিচারের দিন। অলোকা তার সবচেয়ে দামী কাপড় চোপড় বাহির করিয়া, নিজের ঘরে বেশ বিন্যাস করিতে গেল। সকাল থেকেই অলোকার এরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া বাড়ীর সকলেই অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল,—বিশেষতঃ বাড়ীর চাকর মুকুন্দ ও ঝি নিস্তারিণী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, অলোকার সজ্জা আর শেষ হয় না! মহামায়া দেবী নয়টার সময় অলোকার কক্ষে গিয়া দেখিলেন, অলোকা তখনও বেশবিন্যাস করিতেছে।

নে'রে পাগ্‌লী, শীগ্‌গীর নে, দশটা যে বাজে, খাবি দাবি কখন, দশটার সময় যে কোর্ট বস্‌বে......

এই যে মা হয়েচে, সুকুমার বাবু ও বাবা তৈরী হয়েচেন?

হাঁ, তাঁরা খেতে বসেচেন, তুই শীগ্‌গীর নে।

অলোকা প্রসাধন করিল—জীবনে বুঝি কখনও এমনতর প্রসাধন

করে নাই,—বুঝি সুন্দর সাজিবার সাধ এমনতরভাবে জীবনে আর কখনও হয় নাই!

অলোকা স্বভাবতঃই সুন্দরী,—বিশ্বের বাহ্যিক জগতের কোন অলঙ্কার তাহাকে কখনই সুন্দরতর করিতে পারিত না,—কিন্তু অলোকা মেয়ে মানুষ। সুন্দরেরও সুন্দরতর সাজিবার ইচ্ছা হয়। তাই আজ সে তার যতটুকু লাবণ্য সবটুকু মানবের কল্পিত রূপ-নিরূপণের মাপকাটির সাহায্যে একটু বাড়াইতে চেষ্টা করিল। জানি না, তাতে অলোকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল কি না। কিন্তু এটা ঠিক যে, দশজনের চোখে অলোকাকে ছবিটির মত দেখাইতেছিল।

পুরীর কোর্টে সেদিন মহোৎসব। 'বন্দেমাতরম্'—সেই চির-রোমাঞ্চময়, চির-পুলকময়, চির-প্রেরণাময় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে ভারতমাতার পতিত ছেলেরা মায়ের স্তব করিতেছিল,—সে ধ্বনিতে প্রত্যেক পাষাণ পাথর, যাবতীয় জড় পদার্থও বোধ হয় প্রাণলাভ করিয়াছিল। কেহ মারাঠী, কেহ গুজরাটী, কেহ পাঞ্জাবী, কেহ মান্দ্রাজী, কেহ উড়িয়া, কেহ সংযুক্ত প্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশবাসী, কেহ বা বাঙ্গালী! কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টান, কেহ ইহুদি, কেহ শিখ, কেহ বৌদ্ধ,—বিশ্বের ধর্ম্মমত একত্র হইয়াছিল,—বুঝি সেদিন বিধাতার স্বপ্নও সফল হইতে চলিয়াছিল! মানবের ভ্রাতৃত্ব—একতার,—সাম্যের পূত স্বপ্ন বুঝি সেইদিন সফল হইতে চলিয়াছিল; চিরবিরোধরক্তপ্রবাহময় মানব-ইতিহাসের ধারা হঠাৎ রুদ্ধগতি হইয়াছিল—বুঝি ভারতভূমিতেই বিশ্বের অসাধ্যসাধন কর্ম্ম সাধিত হইবে, বিশ্বের শান্তিঘট—মঙ্গলকলস বুঝি ভারতের দ্বারেই প্রথম পড়িবে—এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল।

সেই জনতায় অলোকা। মরি মরি কি রূপ! বুঝি জোয়ান ডি আর্ক, বুঝি দুর্গাবতী, বুঝি রুসিয়ার সেই ওল্গা, বুঝি তুর্কীর সেই হালিডে হানুম্! সকলেই সরিয়া গেল,—সসম্ভ্রমে সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। বুঝি ভারতে আজ নারীর স্থান ভারতের ছেলেরা বুঝিতে পারিয়াছে। অলোকা গর্ব্বস্ফীত হৃদয়ে সেই জনতা ভেদ করিয়া চলিল—চলিল সেই বিচারালয়ে,—যেখানে তরুণের বিচার হইবে।

বিচারালয়ে তিলমাত্র স্থান ছিল না, পুলিশ আবার যাকে তাকে ঢুকিতেও দিতেছিল না। অলোকা যখন আসিল, তখন দাঁড়াইবারও স্থান নাই। কিন্তু যাঁহারা—অনেকেই উকীল ব্যারিষ্টার—চেয়ারে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অলোকাকে দেখিয়া—সাবাস্ ভারতবাসী! এইরূপ নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অনেকদিন বোধ হয় তোমার ছিল না—যাই হোক তাতে ফল হল এই যে মহামায়া দেবী, অলোকা, সুকুমার ও অমরবাবু চেয়ার পাইলেন। এবং শীঘ্র বন্দোবস্ত করিয়া কাছের স্কুল থেকে আরও খানকতক চেয়ার আনা হইল।

সে জনতা—সে জনতার ভাব—সে সব চিত্রিত করা এ ক্ষুদ্র লেখনীর সাধ্য নয়! সে সাধনা এ দীন লেখক করে নাই—তাই আর বাজে কথায় সে বিচারালয়ের দৃশ্য আপনাদের সম্মুখে হাজির করিতে পারিলাম না।

২৩

বিচার আরম্ভ হইল সাড়ে দশটায়। অলোকা বসিয়াছিল ঠিক সামনে। বিচারক খাস বিলেতী সাহেব। তিনি ঠিক ঘড়ি ধরিয়া সাড়ে দশটায় হাজির হইলেন—হঠাৎ বিচারালয় নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ হইয়া গেল।

সে নিস্তব্ধতার এতখানি গাম্ভীর্য্য, যে, বোধ হয় বিচারকেরও হৃদয় স্পন্দিত হইতেছিল। বিচারকের মুখে আর সে দৃঢ়ত্ব নাই। বোধ হইল যেন জনতার মনোবলের চাপে একটু নরম হইয়া আসিয়াছে,—বুঝি সেই জনতার দিকে কর্ত্তৃত্বের সহিত চাহিবারও ক্ষমতা নাই।

কিছুক্ষণ পরেই আসিল রাজবন্দী, রাজদ্রোহী তরুণ। আসিল প্রহরী বেষ্টিত হইয়া।

বিচারালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া উঠিল রব 'বন্দেমাতরম্'। তরুণ,—সমাজদ্রোহী তরুণ, কুৎসিত-দ্রোহী তরুণ, রাজদ্রোহী বিদ্রোহী তরুণ—মস্তক অবনত করিল—বিনয়, ভক্তি, শ্রদ্ধায় মস্তক আনত করিল।

পরক্ষণেই তরুণ তাকাইল সম্মুখে—'কাঠগড়া'য় দাড়াইয়া চাহিবা-মাত্র চোখে পড়িল সেই অতুল্য দেববাঞ্ছিত আননখানি,—অলোকার!

অলোকা তাহার বিদ্রোহী ভাবপুঞ্জকে বোধহয় সংযত করিতে পারে নাই, সম্মুখে চাহিয়া দেখিল সেই গৌরবপ্রতিভামণ্ডিত বিশাল-হৃদয় তরুণ। বোধ হয় চারি চক্ষু মিলিত হইয়াছিল,—তাহা না হইলে, হঠাৎ তরুণ কেমন হইয়া যাইবে কেন? অলোকাই বা কেমন এক রকম

হইবে কেন? সে দৃষ্টি বিনিময়ে কি বিদ্যুৎ তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়াছিল,—তাহা বর্ণনা করিবে কি এ ক্ষুদ্র নগণ্য লেখনী?

তরুণ ভাবিল, এ বিচার দেখিবার জন্য আসিয়াছে অনেক লোক,—হয়ত তাহাদেরই মধ্যে অলোকা একজন দর্শকমাত্র। অলোকা ভাবিল, তরুণ জানে না—জানে না তাহার অন্তরতম কথাটি। তাই বুঝি সে এত উদাসীন।

ভুলু বেচারী একটু দেরীতে আসিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে,—সে সেই জনতার পশ্চাতে 'একঘোরে'টির মত দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দেরীর কারণ, সে বিচারালয়ে আসিবার পূর্ব্বে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিল। সামান্য পরামর্শ নয়—এই পরামর্শের সহিত তরুণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে!—একটা জটিল সমস্যা।

সুকুমার এই বিচার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছিল। শুধু অলোকার খাতিরে নয়, কারণ যে আইনব্যবসায়ী হইবে, সে কোন মামলায় নিজে না থাকিলেও, মামলার ঘনটনাবলী—উভয়পক্ষের—জানিতে সচেষ্ট থাকে। সেই একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সুকুমার উভয়পক্ষের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছিল।

ভুলু যাহাকে উকীল নির্দ্ধারিত করিয়াছিল, তিনি ভুলুর সঙ্গে বিচারালয়ে আসিয়াছিলেন। বিচার আরম্ভ হইতেই তিনি জনতাভেদ করিয়া স্বস্থানে আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু সুকুমারও বিচারালয়ের অনুমতি লইয়াছিল—তরুণের সপক্ষে দাঁড়াইবে বলিয়া।

দেখা গেল, ভুলুর উকীল প্রথম হইতেই মামলায় যে ভাবে তর্ক তুলিল, তাহাতে তরুণের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা। ইহা বুঝিতে

পারিয়াই উঠিল সুকুমার—স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই। তরুণ চাহিল—সুকুমারের প্রতি, আর সেই সঙ্গে চাহিল অলোকার প্রতি।

অলোকার মুখের ব্যাকুলতা—তাহার মূক মৌণ কাতরতা নিবেদন করিল অনেক জিনিস, তরুণের কাছে। তরুণ বুঝিল অলোকা ইহাই চায়,—শুধু চায় নয়—অন্তরের সহিত চায়। তরুণ কিছু বলিল না। ভুলু ইতিপূর্ব্বে তরুণের নিকট সুকুমারের কথা শুনিয়াছিল, সুতরাং ভুলুও কিছু বলিল না। বলিতে গেল সেই উকীল—উকীলকে থামাইল ভুলু। কারণ ভুলুও বুঝিল—বুঝিল সুকুমারের যুক্তি অত্যন্ত উপযোগী। তাহাতে ফল হইল এই, সুকুমার এই মামলায় গোড়া হইতেই কাজ আরম্ভ করিল।

ইহাতে বিচারকও বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, বুঝা গেল। সুকুমারের যুক্তি, বিচারক বিদেশী হইলেও তাঁহার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। তিনি প্রকারান্তরে সুকুমারের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

একধারে বিচারকের সুবিচার, অন্যধারে সুকুমারের সুযুক্তি ও তরুণের ভাবী মুক্তির আশা সমগ্র জনতাকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া দিয়াছিল। সুকুমার চতুর্দ্দিক হইতে বাহবা পাইল—সুকুমারের জীবনে বুঝি এমন গৌরবমুহূর্ত্ত আর কখনো আসে নাই—তাহার হৃদয় গর্ব্বে গরিমায় স্ফীত হইয়া গিয়াছিল। অলোকাও মনে মনে সুকুমারকে অত্যন্ত বাহাদুরী দিতে লাগিল। অলোকাও ইহাতে কম গৌরবান্বিতা হয় নাই।

২৪

বিচার শেষ হইতে সাত দিন লাগিয়া ছিল। জনতা ফলাফলের জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছিল—সবচেয়ে চঞ্চল, অধৈর্য্য হইয়াছিল অলোকা। যাহা হউক, আমরা মামলার আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিব না; কেন না, লেখক আইনব্যবসায়ী নহে। হয়ত আইনের মারপ্যাঁচ বিবৃত করিতে গিয়া ভ্রান্তির জালে পড়িব। রোজকার খবর 'উৎকল বুলেটিনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। যদি আপনারা সেই কাগজখানি দৈনিক পড়িতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মামলার সমস্ত হাল সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

তরুণকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। বিচারক অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি পুলিশের ভ্রান্তি দেখাইয়া তরুণকে মুক্তি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। আর আনন্দিত হইলেন যে, তরুণের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিল একজন যুবক ব্যারিষ্টার, যে অতি সুন্দরভাবে দক্ষতার সহিত এ মামলা পরিচালন করিয়াছে। শেষ দিন অর্থাৎ যে দিন তরুণকে মুক্তি দেওয়া হইল, সেদিন যদি কেউ জনতার স্ফূর্ত্তি দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, যুবক তরুণ ভারতের জনসমাজের হৃদয় কতখানি অধিকার করিয়াছিল। তরুণকে কাঁধে করিয়া সেই আনন্দ কোলাহলকারী জনতা সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল।

তরুণ মুক্ত হইবামাত্র সুকুমারকে অনেক ধন্যবাদ দিল,—সব চেয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ পাইয়াছিল সে বিচারক ও অলোকার নিকট হইতে।

অলোকা অগ্রসর হইয়া সুকুমারের কানে কানে কি বলিয়াছিল,—অমরবাবুও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ একটা গুপ্ত পরামর্শ। সেটা কি, বোধ হয় পাঠকবর্গের জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে।

সেটা হচ্চে এই—অমরবাবু মহামায়া দেবীর অনুরোধে তরুণকে তাঁহাদের সমুদ্রতীরস্থ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সেই দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

মানুষ ও মানুষের মধ্যে সদ্ভাব না থাকিলেও, যদি আন্তরিক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপকার পায়, যত্ন পায়, তবে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতায় ঢলিয়া পড়ে। তরুণ এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারে নাই—অনেক কারণে।

নগর প্রদক্ষিণ হইয়া গেলে ভুলু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বিশেষ কোন কথা হয় নাই, শুধু তরুণ একবার মুচ্‌কে হাসিয়াছিল।

চল—যাওয়া যাক্—

না—আমার নিমন্ত্রণ আছে,—সেই যে অমরবাবু—তাঁর বাড়ীতে, আমাকে এখনি যেতে হবে।

চল একটু বিশ্রাম নেবে।

নাঃ, বিশ্রামের দরকার নেই, বরং তুমিও চল আমার সঙ্গে।

ভুলু সাগ্রহে তরুণের অনুগমন করিল। পথে কত, কত কথা! সেই মৌন কথা—যখন অনেক কথা বলিবার থাকে, তখন যেমন একটা বিরাট মৌন ভাব, একটা নীরবতা আসে—সেইরূপ নীরব কথা।

জনতা তখনও তরুণকে ছাড়ে নাই,—অমরবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত তাহারা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তরুণের অনুগমন করিয়াছিল। এমন কি যখন অমরবাবু নিজে আসিয়া তরুণকে আহ্বান করিয়া

বাড়ীর নীচের দরজা হইতে উপরে লইয়া গেলেন, তখনও পর্য্যন্ত তাহারা আনন্দধ্বনি করিতেছিল। অবশ্য তরুণের বিনয় অনুরোধে আধ ঘণ্টার ভিতর তাহারা সকলেই সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

তরুণকে আদর সম্বর্দ্ধনা করিতে আসিয়াছিলেন অমরবাবু, মহামায়া দেবী, আর আসিয়াছিল সুকুমার। অলোকা যে কেন ঐ দলে ছিল না, তাহার কারণ লেখক জানে না। অমরবাবু ও আর আর সকলে উপরের একটী সজ্জিত কক্ষে বসিলেন। আহারাদির পূর্ব্বে একটু বিশ্রাম বোধ হয় তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

তরুণ অমরবাবুকে সম্যকরূপে চেনে না, তাই প্রথমেই চেনাপরিচয়ের পালা। তরুণ অমরবাবুকে অতি বিনয় সহকারে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই মহামায়া দেবী সভার মাঝখানে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিলেন।

তুমি ত দেবগ্রামের অরুণের ভাই—নয় ?

হাঁ, আপনি কি ক'রে জানলেন ?

কেন, তুমি তো জানো, অলোকার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল, তোমার দাদা অরুণবাবু খুব ঝুঁকেছিলেন,—শুধু অমত করেছিলে তুমি—মনে আছে কি !

তরুণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—হর্ষে, উল্লাসে, কৃতজ্ঞতায়, অনুতাপে, অনুশোচনায় হৃদয় ভরিয়া গেল। ইহার সে কি উত্তর দিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। আরও কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহামায়াদেবী সেই মাসিকখানা, যাহাতে তরুণের ফটো ও রচনা ছিল, সেই খানা তরুণকে দিল,—দিল ঠিক সেই ফটোর পাতাটি খুলিয়া। তরুণ দেখিল—অবাক হইয়া।

এ ফটো তোমার—এ রচনা তোমার ?

হাঁ।

শুধু হাঁ নয়,—এই ত যত নষ্টের গোড়া হয়ে দাঁড়িয়েচে। অবশ্য আমি মা,—মেয়ে মানুষ,—আমার অনেক কথা অমেয়েলী ঠেকবে, তোমার চোখে! কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েচে, তাতে আজ আমি সকলের সুমুখে, লজ্জার মাথা খেয়ে, জোর গলায় বলছি—যদি তোমার সঙ্গে অলোকার বিয়ে না হয়, তবে অলোকা বোধ হয় বাঁচবে না! একে সে কঙ্কালসার হয়ে গেচে, আমরা সেই জন্যেই পুরীতে এসেছি, অলিকে সারাতে। এখন সুযোগ পেয়ে তোমায় সব কথা খুলে বলছি। এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। তোমার উপুর আমাদের কোন জোর নেই,—বিবাহ জিনিষটা জোরের কাজও নয়,—আমার বড় ইচ্ছে তুমি অলিকে বাঁচাও······আমার আর কিছু বলবার নেই।

ভুলু অমরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ওঃ বুঝেছি, আপনি বুঝি রামপুরের জমিদার!······বিয়ের কথা আমি শুনেছিলাম······"

তরুণের এবার সব কথা মনে পড়িল······সে অবাক, আশ্চর্য্য, বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার কথা কহিবার শক্তি রহিল না।

অলোকা ও সুকুমার দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল।

অলোকা—সুকুমারবাবু,—আমি আপনার কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী—আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না······

বলিতে বলিতে কথা আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া গেল।

অলোকা! জীবনের আমার প্রথম ভালবাসাটুকু দিয়েছিলুম—তোমায়,—জান তো কত দৃঢ়, কত গভীর, কত বিশাল!

সুকুমার আর বলিতে পারিল না।

অলোকা মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

অলোকা! তুমি সুখী হবে, এর চেয়ে আমার আর কি সুখ আছে! আমার ভালবাসার সার্থকতা হবে,—দেখে তোমার সুখ,—তোমার সুখময় জীবন।

অলোকা—আপনি আমায় ক্ষমা করুন······

ক্ষমা,—ক্ষমা কেন? অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলে একটি দেবতুল্য চরিত্র—একটা বিশাল-হৃদয় সাহসী যুবককে! শুধু বাপ মায়ের জেদে, কতকটা আমার আগ্রহে, আমাকে তুমি একটু উৎসাহিত করেছিলে! তুমি জান্‌তে দাওনি তোমার নীরব গোপন সাধনার কথা—এটা ত একটা খুবই প্রশংসার জিনিস—তার জন্যে আবার ক্ষমা কি! অলোকা, মনে ক'রো না, আমি এতে বিন্দুমাত্র তোমার ওপর রাগ করচি—তোমার মনের ভাব আমার ওপব যে কি,

তাও বুঝতে পেরেছি। দুঃখ শুধু আমার—বিরাট দুঃখ হবে, কিছুতেই এড়াতে পারবো না তাও বুঝছি,—কিন্তু তা বলে আমি তোমার সুখের পথে দাঁড়াতে পার্‌বো না।

আপনি আর একটা মনের মত বেছে নিন,—সুখী হবেন।

অলোকা, তুমি কি পাগল? পাগলের মত কি বাজে বক্‌চো? তোমার স্মৃতিকে মুছে ফেল্‌তে আমার অন্ততঃ এ জীবনটা যাবে······ আর অন্য কোন নারী আমাকে পাবে না,—তবে একটা শান্তি, যে তুমি সুখী!

আমি আপনার অনুরাগ ভুলতে পার্‌বো না—।

আর পারবো না আমিও ভুল্‌তে তোমার স্মৃতি,—তোমার সুন্দর মুখখানি।

এমন সময় তরুণ আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল।

দেখুন তরুণবাবু, আজ আপনি যে রত্ন পেলেন, এর দাম নেই, এ শুধু জগতের অতি অল্পসংখ্যক মানুষের ভাগ্যে জোটে—এমন—এমন সুন্দর—

সেটা আমি আজ সম্পূর্ণ উপলব্ধি কর্‌চি সুকুমারবাবু—আপনাকে আর বলে দিতে হবে না।

সুকুমার একটা কাজের অছিলা করিয়া চলিয়া গেল।

অলোকা!

অলোকা আনত বদনা, নীরব।

অলোকা!

যান্—আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না—আপনি বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্ম্মম!

আমার ভুল—অজান্‌তে ভুল—তোমায় উপেক্ষা করা—ক্ষমা কর……।

অজান্‌তে ? কখনই নয়—

হাঁ,—আমি সত্যের নাম নিয়ে বল্‌ছি—আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

এমন সময় আসিলেন মহামায়াদেবী—সেই বারান্দায়।

আমি মনে কর্‌ছি, আস্‌চে সোমবার ফিরবো—একসঙ্গে, আর তেইশে বিয়ে,—বেশ ভাল দিন,—তোমার আপত্তি আছে ?

না—আপত্তি আর কি ! বেশ ত। তবে, আমি গেলে ভুলুও হয় ত যাবে, 'বুলেটিন্‌'খানা দেখ্‌বে কে ? জগন্নাথ বাবুর সঙ্গে এ কথাটা মোটেই হয়নি,—বোধ হয় তিনি সন্ধ্যেবেলা আস্‌বেন, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দিনকতকের জন্যে কাগজখানা চালাবার বন্দোবস্ত করে নিতে হবে।

উনি তোমার দাদাকে সব জানিয়েচেন—এ বিবাহের কথা।

তবে ত আরও ভাল, ওঁরাও তৈরী হতে পার্‌বেন, সময় বড় কম।

এমন সময় ভুলু তরুণকে ডাক দিল।

মহামায়াদেবী—'না, তরুণ এখন আমাদের, ওর কোথাও বাসায় যাবার দরকার নেই,—তরুণ এইখানেই থাকবে।'

ভুলু—তবে ত ভালই। লাভের মধ্যে আমারও আহারাদির ব্যবস্থা একটু সুবিধে গোছের হবে।

তরুণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

২৬

এবার একটু দেবগ্রামের কথা।

অরুণ তরুণসম্পর্কিত ব্যাপার সবই জানিত। কিন্তু কেরাণীর ছুটী নাই, চাকরীর মায়া থাকিলে লোকে সহজে, দরকার পড়িলেও, কামাই করিতে পারে না! এক্ষেত্রে হইয়াছিল ঠিক তাই। সাহেব কিছুতেই ছুটি দেয় নাই,—বেচারীকে অগত্যা নীরব হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তবে ভুলুর নিকট হইতে চিঠি আসিত প্রায়ই, অরুণ সমস্ত খোঁজ খবর ভুলুর নিকট হইতেই পাইত।

ভুলু, পাছে আবার অরুণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, সেই জন্য সঠিক খবর সব জানায় নাই, কিছু কিছু গোপন করিয়া রাখিত। কিন্তু পারে নাই গোপন করিতে তরুণের বন্দী হওয়ার কথাটা। কারণ সেটা ভারতময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে ভুলু যথাসম্ভব আশ্বস্ত করিত,—প্রায়ই লিখিত বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নাই, শীঘ্রই সে মুক্ত হইবে; খবরের কাগজে সব জিনিস বাড়াইয়া লেখা হয়, ওসব যেন তিনি বিশ্বাস না করেন; তরুণের দোষ তেমন গুরুতর নয়, হয় তো কিছু জরীমানা হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে কি ভায়ের মন সান্ত্বনা পায়! অরুণ কিন্তু সব খবর বাড়ীতে বলে নাই,—মাকেও নয়, প্রতিভাদেবীকেও নয়। আর আর যাহারা অরুণের বাড়ীতে আসিত, সকলকেই অরুণ ওসব কথা বলিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল! অরুণ দিনরাত মন্‌মরা হইয়া থাকিত —মুখে একদম কথা ছিল না। এতখানি গম্ভীর ভাব দেখিয়া প্রতিভা,

মা সকলেই কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। অরুণ একটা কিছু বলিয়া উড়াইয়া দিত। কিন্তু মায়ের প্রাণ! মা যেন সবজান্তা জীব! যেন ছেলের আপদ বিপদের কথা 'ওয়ারলেসে' মায়ের হৃদয়ে আসিয়া হাজির হয়!

হ্যারে অরুণ, তরুণের হাতের লেখা কতদিন পাচ্ছি না। আমার মনটা কেমন কর্‌ছে। তুই শীগ্‌গীর ওর খবর জান্। তা নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।......

তোমারও যেমন—দুদিন চিঠি আসেনি ত কি হয়েছে? ভুলু লিখেচে তরুণ এখন কাজে বড়ই ব্যস্ত—তাই চিঠি দিতে পার্‌চে না, তরুণ ভাল আছে—তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না...হয়তো দু'একদিনের মধ্যে ওর চিঠি আস্‌চে—ইত্যাদি স্তোক বাক্যে মায়ের উদ্বিগ্নতাকে প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিত!

এরূপ কথাবার্ত্তা রোজই হইত,—সন্ধ্যাবেলা অরুণ আফিস থেকে এলেই। কিন্তু অকস্মাৎ এক দিন এ অন্ধকার কাটিয়া গেল—চিঠি আসিল, তরুণের নয়,—অমরবাবুর। সেদিন সন্ধ্যাবেলা অরুণ আসিল সহাস্যমুখে।

কিরে তরুণের চিঠি এল না কি?

না,—ওর বিয়ে,—বিয়ের যোগাড় কর!

সে কিরে? বিয়ে কি? কার সঙ্গে? কোথায়? কবে?

কেন সেই রামপুরের জমিদার, অমরবাবুর মেয়ের সঙ্গে,—যাকে বিয়ে করবে না সে বলেছিল, মনে নেই?

সত্যি করে বল! সত্যি, সত্যি?

হাঁ,—এই দেখ না চিঠি, অমরবাবুর নিজের হাতের লেখা। তিনি তরুণের মত করিয়েচেন।

প্রতিভাদেবী 'বিয়ে বিয়ে' রব শুনিয়া রান্নাঘর হইতে আসিলেন। কি মা! ঠাকুরপোর বিয়ে বুঝি! আমি ক'দিন ধরে ঠাকুরপোর বিয়ের স্বপ্ন দেখ্‌চি—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।—প্রতিভাদেবী অগ্রসর হইয়া অরুণের হাত হইতে সেই চিঠিখানি লইলেন, ও মাকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়া হইলে প্রতিভাদেবী বলিলেন—তবে ত আর সময় নেই,—শীগ্‌গীর করে সব যোগাড় টোগাড় করুন, ঠাকুর্‌পো যেমন দুষ্টুমি করে বিয়ে করবো না বলেছিল, তেমনি দর্পচূর্ণ হয়েচে! আসুক্ না একবার, বলবো,—কইগো তোমার প্রতিজ্ঞা! মুখে চূণ কালি দেবো···মা আপনি নিন, ঘরদোর সব পরিষ্কার করতে হবে,—সাজাতে হবে,—ঠাকুরপোর বিয়ে!

উমাদেবীর আনন্দ দেখে কে!

২৭

পরাশর ভট্টাচার্য্যের কথা আপনাদের অবিদিত নাই। পাড়ার বুড়োদের লইয়া বৈঠকখানায় জটলা করা ছাড়া তাঁর বোধ হয় আর কিছু কাজ ছিল না। তিনি সমাজের মোড়ল—প্রাচীন সমাজ দিন দিন উচ্ছন্ন যাইতেছে, বাবুরা টেরী কাটিয়া আফিস যাইতেছে, পেঁয়াজ খাইতেছে, ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষে সমাজ অধঃপথে যাইতে বসিয়াছে —এই আলোচনাই তাঁহার প্রধান উপাদেয় সামগ্রী।

ব্রাহ্মণদের আদর দেশ হইতে বিতাড়িত হইতেছে—সেই প্রাচীন আর্য্যবংশধর—বেদের আর্য্য, উপনিষদের আর্য্য, রামায়ণ মহাভারত যুগের কীর্ত্তিকেতনবাহী বংশধর জীব এই ব্রাহ্মণশ্রেণী—তাহাদেব দক্ষিণা কমিয়া যাইতেছে,—গৃহস্থের কর্ত্তাদেব শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে,—তা নইলে কি ব্রাহ্মণদের ভাবনা! তাহারা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত।

এক আছে গৃহস্থের মেয়েদের একটু ব্রাহ্মণভক্তি। তারা যদি ব্রাহ্মণদের সেবা না করিত, তাহাদের যদি ব্রাহ্মণ জাতির উপর অচলা ভক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কলি বোধ হয় উল্টাইয়া যাইত।

ব্রাহ্মণ কত বড়! তাহাদের মেয়ে মহলে অবাধ গতিবিধি!—এই প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া—ওমুকের মেয়েব পনের বছব বয়েস হলো, যৌবনের রেখা পড়্‌লো—এখনো বিবাহ হয় নাই—সমাজ নিশ্চয়ই উচ্ছন্ন যাইতেছে—এইরূপ ভাবপ্রবাহ পরিশেষে আসিয়া পড়িত। পাড়ার বুড়োরা তদ্‌গতভাববিহ্বলচিত্তে শ্রবণ করিতে করিতে পাশমোড়া

দিয়া হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিত। আর চাকরকে হুকুম করিত—ওরে ব্যাটা, কোথা গেলি, আর এক ছিলিম চাপা না!

তাই তো—ও পাড়ায় আবার মেয়ে ইস্কুল হচ্চে!

বটে? কোন ব্যাটার আবার মতিচ্ছন্ন হলো! বলিয়া পরাশর ভট্টাচার্য্য ধমক দিয়া উঠিলেন। 'কোলকেতা থেকে এক বেরাম্মো না খিষ্টান মেয়ে এয়েচে, সে বলে স্ত্রীশিক্ষ্যে বিস্তের করবে। .....

বটে?

ও পাড়ায় ওসব কিছু হতে পারবে না—এই দেবগাঁয়ে পরাশর ভট্টাচায্যি থাকতে ওসব হবে টবে না বাবা, সেবেফ্ বলে দিচ্ছি।

না গো, আমি তাই শুনে আবার দেখ্‌তে গিছলুম। মেয়েটির অনেক বয়েস হয়েচে—প্রায় তিরিশ বচর। কিন্তু আহামরি রূপ—বলিহারি যাই।

সত্যি না কি! পরাশর ভট্টাচার্য্য একটু চমকিত হইল। এখনো ইংরেজী বিদ্যে পেটে ঢোকেনি, তাই এখনো চালকলাটা আমাদের বজায় আছে। আব এই নেকাপড়া ঢুকলে কি আর রক্ষে আছে বাবা,— বামুন জাতটা একেবারে পথে মারা যাবে।

ঘোর কলি! ঘোর কলি! বুড়োর দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

মা ধরিত্রী এতও সইচে,—মালক্ষ্মীরা যাই বামুনদের মান্‌তো, তাই এখনো কলি বজায় আছে। নইলে কোন দিন সব ওলোট পালোট হয়ে যেতো।

তার নামটা কি জানো?—পরাশর ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল।

কি জানি বাবু, তা জানিনে—কি ছাই পাঁশ নাম কি মনে থাকে,—কি-বলে ললিতা না কি!

বটে ?

এখন কোথায় রয়েচে ?

ঐ যে হারু চাটুয্যের বাড়ীর পাশে যে ভাড়াটে বাড়ীটা আছে, সেই বাড়ীতে।

এই প্রকারে তাহাদের সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত, বউঝিদের কুৎসা, অশ্লীল বাক্যপ্রবাহ—ভাবপ্রবাহ—এই ছিল তাদের মহাসভার মীমাংসার বিষয়।

প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা দেখা যাইত—পরাশর ভট্টাচার্য্য হারু চাটুয্যের বাড়ীর পাশে সেই ভাড়াটে বাড়ীর দিকে যাইতেছেন। লোকে বলাবলি করিত, পরাশর ভট্টাচার্য্য বড় একগুঁয়ে লোক, ব্রাহ্ম মেয়েকে মেয়ে স্কুল কিছুতেই করিতে দিবে না। সেই জন্য বেচারী উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সকলেই এক বাক্যে, বিশেষতঃ পাড়ার বৃদ্ধেরা, পরাশর ভট্টাচার্য্যের তারিফ্ করিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু পরাশর ভট্টাচার্য্য—বড় একটা দিনের বেলায় সেদিকে ঘেঁসিতেন না। যেমনি গাঢাকা সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিত, পরাশর ভট্টাচার্য্য দ্রুত-পদে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া সেই পথে অগ্রসর হইতেন। তিনি সকলের নিকট বলিতেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রালোচনা করিতে হয়,—তার পর ধর গিয়ে একটু বিশ্রাম দুপুর বেলা,—সময় কই,—তাইতে তিনি বাধ্য হইয়া সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন!

পরাশর ভট্টাচার্য্য যখন এ কথা বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই—তাহা অতি বিশুদ্ধ কথা, শাস্ত্রীয়,—সুতরাং ইহাতে কাহারো কিছু সন্দেহ করিবার ছিল না।

ললিতা প্রথম প্রথম পরাশর ভট্টাচার্য্যের শুভ আগমনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার যাহা কিছু বর্ণনা করিবার ছিল, সবই বলিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, সে এফ-এ. পর্য্যন্ত

পড়িয়াছে। স্বামী-বিয়োগ হওয়ায়, অর্থের অপ্রাচুর্য্যে ও মনের মত কর্ম্মের অভাবে সে বাধ্য হইয়া বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনার মৎলব স্থির করিয়াছে। ইহা তাহাকে করিতেই হইবে,—বাংলা দেশের নারী সম্প্রদায়—একটা বিরাট অর্দ্ধমৃত মোহাভিভূত, অর্দ্ধ চেতন প্রাণী বিশেষ,—তাহাদের জাগাইয়া তুলিতে হইবে, মানুষ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আর কি উচ্চতম আদর্শ সে এ বৈধব্য দশায় বরণ করিতে পারে? কোন রকমে ত সময় কাটাইতে হইবে! ইহাই তাহার জীবনের ব্রত,—ইহাই সে করিবে।

পরাশর ভট্টাচার্য্য যে কি বলিবে, তাহা স্থির করিতে পারে নাই। পরাশর ভট্টাচার্য্য ললিতার সেই রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল,—তাহার বিরাট প্রাচীন যুগের তুঙ্গ আদর্শের প্রাণ-মাতানো প্রেরণা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখার হইয়া গেল।

রোজ কাজ হইল,—সন্ধ্যাবেলা গিয়া ললিতার সঙ্গে ভাব করা। ললিতাকে তাহার ভাল লাগিত। ললিতাও আপত্তি করিত না। কেন না, পরাশর ভট্টাচার্য্য শিক্ষিত পণ্ডিত,—তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সময় কাটানো নেহাৎ মন্দ বন্দোবস্ত নয়।

সেদিন অরুণের অফিস হইতে ফিরিতে একটু রাত্রি হইয়াছিল। রাত্রি অন্ধকার। অরুণের বাড়ী ফিরিবার পথে ললিতার সেই ভাড়াটীয়া বাড়ীটি পড়িত। অরুণ যাই সেই বাড়ীটির কাছে আসিয়াছে, একটা স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত অস্ফুট এবং করুণ কাতরোক্তি অরুণের কর্ণগোচর হইল। অরুণের মনে কেমন একটা খটকা উপস্থিত হইল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই সে কাতরোক্তি একটা দারুণ চীৎকারে পরিণত হইল। অরুণ ছুটিয়া গেল.........।

মাতাল ও দুশ্চরিত্র পরাশর ভট্টাচার্য্যের এই কীর্ত্তি-কলাপ শীঘ্রই গ্রামে প্রচারিত হইল। অনেক ভদ্রলোক তথায় আসিলেন। অরুণ ললিতার সাহায্যে পরাশর ভট্টাচার্য্যকে পুলিশে দিল।

তাহার বিচারের সময় সাক্ষ্য দিয়াছিল পাড়ার অনেকেই,—তার মধ্যে ছিল অরুণ। পরাশরের আর সে সামাজিক স্পর্দ্ধা নাই,—এখন সে সকলের ঘৃণার্হ।

এ খবর যখন ভুলু পাইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই সে অন্তরে অন্তরে আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। কেন না ভুলুদের 'একঘোরে' করিয়াছিল সেই সামাজিক কর্ত্তা অত্যাচারী পরাশব ভট্টাচার্য্য। ভুলুর চেয়েও সুখী হয়েছিল, এ সংবাদে তরুণ।

অমরবাবু পুরী ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। কাল সকালের ট্রেণে সকলেই গৃহাভিমুখে রওনা হইবে।

তাই আজ সন্ধ্যায়—এই ফুটফুটে জ্যোছনার অভ্যুদয়ে তরুণ ও অলোকা, সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে, কথা কহিতে কহিতে তাহারা চলিয়া গিয়াছিল অনেক দূর,—অতি নির্জ্জন নিস্তব্ধ,—পুরীর সেই উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-সৈকতে।

ক্রমে জ্যোছনা সমগ্র স্থানটুকু উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল,—দিবাবসানে মানব-সমাজের কোলাহল অনেকক্ষণ মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। তাই বুঝি সেই সুযোগ পাইয়া মহাসাগরের বিপুল ভৈরব কল্লোল আরো উচ্চ তানে অনাদি কীর্ত্তন সুরু করিয়াছে! আকাশের তারাপুঞ্জ সেই গান শুনিতে শুনিতে বুঝি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল! বিধাতার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের সিংহদ্বার আজ বুঝি সহসা খোলা হইয়াছে! অনেকক্ষণ অলোকা ও তরুণ কথা কহে নাই। কি কথা কহিবে! তাহাদের ভাবরাশি মানবজাতির নিরূপিত ভাব-প্রবাহের পন্থা,—সেই ভাষারাজ্য অতিক্রম করিয়া বহুদূর ছাপিয়া গিয়াছে।

সেই প্রাণমাতানো সমীরণ,—সেই পাগল-করা সৌন্দর্য্যের হাট, সেই বিরাট, বিশাল জলধির সুগম্ভীর পুলকময়, চির-অভিনব বার্ত্তা অলোকা ও তরুণকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে,—যখন স্বপ্নরাজ্য ছাড়িয়া, মানুষ মাটির ধরিত্রীতে পা দেয়, যখন রক্তমাংসের টানে একটু নরম হইয়া আসে,—সেই রকম ক্ষণে তরুণ সহসা বলিয়া ফেলিল,

অলোকা, তুমি বড় সুন্দর!

হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিল অলোকার,—এ যে বড় সুন্দর কথা! কত সঙ্গীতময় কথা—তুমি বড় সুন্দর!

লজ্জাবনতা, বিনয়াবনতা, সরমপীড়িতা অলোকা কথা কহে নাই।

কি কথা কহিবে?

জীবনে এমন অনেক সময় আসে,—যখন,—মৌন ভাবই অনেক কথা বলিয়া দেয়,—সেইখানেই যেন শত বক্তৃতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তাই বুঝি অলোকা কিছু বলে নাই।......

আজ দয়িতের সন্ধানে, প্রেমের সন্ধানে যারা তীর্থযাত্রা করিয়াছে, শুধু তারাই বুঝিবে, সৌন্দর্য্য মানুষের মনে, হৃদয়ে!—ভাষায় নহে!—রূপে নহে,—অলঙ্কারে নহে,—সম্পদ মর্য্যাদায় নহে।

যাহার মন সুন্দর, এ জগতে সেই সুন্দর, সেই পূজ্য, সেই আরাধ্য, সেই উপাসনার সামগ্রী!

ফিরিয়া আসিবার সময় পথে, দেখা হইল ভুলুর সহিত। ভুলু বলিল একদল যুবক শোভাযাত্রা করে বেরিয়েচে, গান গাইতে গাইতে,—এই এসে পড়্লো বলে!

বাস্তবিকই তাই। একটু বাদেই, রাস্তায় একদল যুবক গান গাইতে গাইতে আসিতেছিল,—তাদের নেতার হাতে ছিল একটি লাল-পতাকা।

ভুলু বলিল, 'দেখে'ছ লাল-পতাকা? কেমন সুন্দর দেখাচ্চে?

তরুণ—"আমি বড় ভালবাসি,—লাল-পতাকা।"

'আমিও' বলিল অলোকা।

সমাপ্ত